গুম্ফবতী

শিবরাম চক্রবর্তী

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ, ১৩৬৩

প্রকাশক ঃ
এন্ ঘোষ
সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রক ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা-৬

দাম ঃ আঠারো টাকা

॥ প্রাণকেষ্টর দুই কাণ্ড ॥

প্রাণকেষ্টর সব কাণ্ড লিখতে গেলে একটা মহাভারত হয়। তার কীর্তি-কথা একমুখে বলবার নয়। তাহলেও সবার সম্মুখে বলবার মতো। সেই বিচিত্র কাহিনীর প্রথম কাণ্ডটি এখানে শুরু করা হচ্ছে।

প্রাণকেষ্টর ধারণা তার শিক্ষার বয়স এখনো পেরোয়নি। সত্যি বলতে, কারোই সে বয়স পার হয় না। কখনই না, কিন্তু আশ্চর্য, কারো সে ধারণা নেই। সেই ধারণাটাই প্রাণকেষ্টর হয়েছে, সবসাধারণতার থেকে এইখানেই তার ব্যতিক্রম।

শিখবে তো, কিন্তু কী শিখবে? শেখবার মতে কী আছে? আছে অনেক কিছু যা তার শক্তির বাইরে—শেখবার শক্তি এবং ধারণা শক্তির বাইরেই তার,—আবার অনেক কিছু আছে যা তার এক-আধটু আধা-খ্যাঁচরা শিখে রাখা।

যেমন এই মোটর-চালানো শিক্ষাটাই ধরা যাক না। একবার একজনের গাড়ী বাগে পেয়ে এই শিক্ষাটা বাগিয়ে আনবার সে চেষ্টা করেছিল কিন্তু দখল হবার আগেই গাড়ীটা বে-দখল হয়ে গেল। যার গাড়ী, প্রাণকেষ্টর কৃপায় সে অধিকতর শিক্ষালাভ করে লোহার দরে গাড়ীটা বেচে দিয়ে সেই মূলধন নিয়ে লোহার কারবারে জমে গেছে। তার কেমন ধারণা হয়েছিল, প্রাণকেষ্ট যেভাবে লেগেছে তাতে ও-গাড়ী থাকবার নয়—এমন কি, অচিরেই গাড়ী আর প্রাণকেষ্ট দুজনেই যাবে এক সঙ্গে সহমরণে। অতএব বেচে দিয়ে গাড়ীর দুইকুল বাঁচানো গেল—গাড়ী ও প্রাণকেষ্ট।

লোহার কারবারে এখন সে এত লোহা জমিয়েছে, যাকে জমানো সোনা বা রূপাই বলা চলে,—শোনা কথা নয়, প্রাণকেষ্ট স্বচক্ষেই গিয়ে দেখল সেদিন। লোকটাও লৌহ-ঘটিত হয়ে কেমন যেন লক্কর হয়ে গেছে। সে লোক থাকলেও সে লৌকিকতা নেই। এখন তো ইচ্ছে করলে অমন গাড়ী সে চারখানা কিনতে পারে, এমন অলৌকিক কিছু না। কিন্তু প্রাণকেষ্টর প্রস্তাবে সে ঘাড় নাড়ল আর বলল—আর না। ভাবখানা যেন এরকম যে, গাড়ী একবার বেচেছে, আর তার মুখদর্শন করবে না—অন্ততঃ প্রাণকেষ্ট বেঁচে থাকতে নয়। তবুও সে হাল ছাড়েনি, বলেছে, আচ্ছা, আমি যদি ভালো করে মোটর চালাতে শিখি? তাহলে? তাহলে কিনবে ত?

—শেখো তো আগে। তখন দেখা যাবে।

জবাবটা যেন একটু আশাবাদীর মতই। শিখতে আরম্ভ করে পাঠদশায় হয়ত সে এমন করেই চালাবে যে, অক্লেশেই নিজেকে পর-পারে চালিয়ে নিতে পারবে সেজন্যে তার বন্ধুর আর আলাদা গাড়ী কেনার দরকার হবে না।—বন্ধু হয়েও কি রকম স্বার্থপর হতে পারে প্রাণকেষ্ট তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ওকালতির অবশ্যি সে কিছু কম করেনি। এও বলেছিল—বিনে পয়সায় আমার মতো একজন ড্রাইভার পাচ্ছ। অমনি পেয়ে যাচ্ছ—এটা কি তুমি লাভ বলে মনে করো না? অমনি তোমার গাড়ী চালাব, এক পয়সা নেব না, অথচ হুকুম করলেই হাজির! এক পাড়াতেই তো আছি। যাব কোথায়?

তবুও ঘাড় নেড়েছে তার বন্ধু। কী ভেবে কে জানে। বাস্তবঃ উভয়ের পাশাপাশিই বটে, কিন্তু মোটর কেনার পর প্রাণকেষ্ট অপঘাতে না গেলেও তার অস্তিত্ব কোথায় থাকবে বলা কঠিন। সত্যি বলতে, কলকাতার কোথায় না থাকবে! টালা থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে সব রাস্তাতেই সে ঘুরচে—উক্ত মোটরের ড্রাইভারের আসনটিতে তাকে দেখা যাবে। তোমার আর অসুবিধা কি? মাঝপথে হাঁ করে

রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো, দেখতে পেলেই হাঁক ছাড়ো, গাড়ী তোমার পাশেই এসে হাজির, উঠে পড়ো তখন। অসুবিধেটা কি?

কিন্তু প্রাণকেষ্টর বন্ধুত্বে যতখানি আগ্রহ, যেমন অকৃত্রিমতা, বন্ধুর প্রাণকেষ্টত্বে ঠিক ততখানিই ভেজাল। যাই হোক, ওর মোটর চালানো শিখতে তো কোনো হানি নেই—নিজের প্রাণহানি বা অন্য প্রাণী-হানির সে কেয়ার করে না। তারপর শিখে চালাবার লাইসেন্স পেলে পর, বিনা-দক্ষিণার বদলে না হয় বেতন নিয়েই শহর প্রদক্ষিণ করবে। তার বন্ধু না হোলো বয়ে গেল, শোফারের চাকরিই না হয় সে করবে যে কোনো মোটরওলার কাছে—মন্দ কি? মোটর চালানো একটা কাজ তো? আরামের কাজ! তাছাড়াও, একটা মোটরকে নিজের আয়ত্তে আনা কম কাজ নয়।

এক মোটর-শিক্ষালয়ের ঠিকানা জানা ছিল। শখের খাতিরে বা পেশার জন্য কেউ মোটর চালানো শিখতে চাইলে সেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তার সুব্যবস্থা আছে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পাঠে একথা সে জেনেছিল। সেইখানেই গেল সে।

শিক্ষালয়টা একটা মেরামতি কারখানা মাত্র, প্রাণকেষ্ট দেখল। কয়েকখানা মোটরগাড়ী নিয়ে মিস্ত্রি-মজুর জন-কয়েক উঠে পড়ে লেগেছে। আস্ত মোটরকে ভাঙছে আর ভাঙা মোটরকে জুড়ছে। একখানাকে তিনখানা আর তিনখানাকে একখানা করা—এই তাদের কাজ বলে তার মনে হোলো। মোটরদের তারা দস্তুরমত শিক্ষা দিচ্ছে—হয়ত বা বলা গেলেও, তাদের কাউকে বিজ্ঞাপনকথিত উক্ত উপযুক্ত শিক্ষক বলে প্রাণকেষ্টর বোধ হোলো না।

কারখানার একদিকে আপিস ঘরের মতো একটুখানি ছিল। টেবিল চেয়ারে জমানো জায়গাটা। প্রাণকেষ্ট সেইখানে গিয়ে খোঁজ নিল।

আরেকটি যুবক ছিল সেখানে—সভ্য ভব্য স্মার্ট। তাকেই শিক্ষক বলে সন্দেহ করে এগিয়ে গেল প্রাণকেষ্ট—আজ্ঞে, কিছু মনে করবেন না। আপনিই কি মোটরশিক্ষক? জিগেস করল ও।

—অজ্ঞে না। আমি শিখতে এসেছি।

এই সময়ে হৃষ্টপুষ্ট এক ভদ্রলোক সেখানে ঢুকলেন—দিব্যি অমায়িক চেহারার।

—কে যেন মোটর শিক্ষকের কথা বলছিল না? শুনলাম যেন। বললে সেই আগন্তুক।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমি। প্রাণকেষ্ট জবাব দিল।

—আমার ড্রাইভারটা প্রায়ই কামাই করে। মাঝে মাঝে কোথায় যে পালিয়ে যায় জানি না। দেখছি নিজে না চালাত শিখলে আর চলে না, যুবকটি তাঁকে জানাল।

—ও, আসলে তুমি একজন শিক্ষার্থী? ভদ্রলোক বললেন।

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

এইবার সেই বিপুল-বপু লোকটি প্রাণকেষ্টর দিকে ফিরলেন।—এই শিক্ষার্থীটি ততক্ষণ বসুন, ইতিমধ্যে আমরা একটু মোটরে করে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? জিগেস করলেন তিনি প্রাণকেষ্টকে।

এই অতিকায় ভদ্রলোক, ডাঃ প্রতুলচন্দ্রের অতিশয় ভদ্রতার কথা সে অঞ্চলে কারো অবিদিত ছিল না। তাঁর অমায়িকতায় রুগীরা যেমন মুগ্ধ ছিল, তাঁর বৌ তেমনই তিতি-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার কারণ আর কিছু না, তাঁর এই ভাব-বাচ্যের কথাবার্তা।

রুগী এবং স্বীয় পত্নীর প্রতি (তিনি রুগী না হলেও) তাঁর অভিন্ন আচরণ।

সকালে উঠেই প্রথম কথা তাঁর ছিল—একবার জিভটা তো দেখতে হয়।

বৌ জিভ বার করতে একটু দেরি করলে তাঁর বাক্যের দ্বিতীয় ভাগ শোনা গেছে—জিভটা একবার আমাদের দেখানো দরকার। লজ্জা কি দেখাতে? লোকে তো জিভ বার করে ভেচিও কাটে।

তারপর জিভ-টিভ দেখে নাড়ি-টাড়ি টিপে হয়ত বলেছেন—

আজকে আমরা বেশ ভালই আছি মনে হচ্ছে তবু একটু সিরপ অফ ফিগস্ খেয়ে রাখা ভালো। দু'চামচ মাত্রায় সম পরিমাণ জলের সঙ্গে খাব আমরা—কেমন? পেট পরিষ্কার থাকলে কখনো আমাদের কোন অসুখ করবে না। (বলা দরকার, এই সিরপ তিনি স্বয়ং কখনো খেতেন না।)

রুগী অন্তিম দশায় পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এই আত্মীয়-ভাব বজায় থাকতে দেখা যেত। কেবল সেই চরম ক্ষণে, রুগীর যায় যায় অবস্থাতেই তিনি ভাববাচ্য এবং উত্তম পুরুষের বহুবচন পরিত্যাগ করে অধম পুরুষের একবচনে নেমে আসতেন। 'আমরা ভালো হয়ে উঠব, সেরে উঠব, ভয় কি? যে-তিনি এই কথাই আগের ভিজিটে বলে গেছেন, সেই-তিনিই, কেন বলা যায় না, 'আমাদের আর বাঁচানো গেল না' একথা না বলে 'ওকে আর বাঁচাতে পারলুম না। অক্কায় পেল বুঝি'—এই কথাই বলে ফেলেছেন।

যুবকের কথা শুনে প্রতুলচন্দ্রের মনে হোলো তাঁর সোফারেরও তো প্রায় সেই ব্যারাম। পালিয়ে যাওয়া ব্যারাম ঠিক না হলেও, ব্যারাম হলেই সে পালিয়ে যায়। হয়ত ডাক্তারি চিকিৎসার ভয় ততটা তার নয় যতটা বুঝি বা ডাক্তারের আত্মীয়তার—

এই যেমন আজকে তার আর টিকি দেখা যাচ্ছে না। প্রতুলচন্দ্র মনে করলেন, ঐ যুবকের অনুকরণীয় আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর নিজেরও মোটর-চালনাটা রপ্ত করে রাখলে মন্দ হয় না। এবং শিক্ষককেও যখন এত সহজে, আসা মাত্রই হাতের নাগালে পাওয়া গেছে তখন এ-সুযোগ ছাড়া কেন?

—একটু মোটর চালানো তা হলে শেখা যাক। কেমন? প্রাণকেষ্টকে তিনি বলেছেন—সাঁতার শেখার মতো মোটর চালানোটা আমাদের প্রত্যেকেরই শিখে রাখা দরকার—কখন কি কাজে লাগে তাই নয় কি?

—সে কথা ঠিক। বলেচে প্রাণকেষ্ট।

ডাঃ প্রতুলচন্দ্র এবং তার ভাববাচ্যের সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় না থাকায় তাকেই সে মোটর-শিক্ষক বলে ভ্রম করেছে বলাই বাহুল্য। কিন্তু ডাক্তার যে তাকেই শিক্ষক বলে ঠাউরেচেন, এ তথ্য সে ধরতে পারেনি।

তাদের কাছাকাছি প্রকাণ্ড একটা সালুন্ গাড়ী তখনো অটুট অবস্থায় ছিল—তখন পর্যন্ত মিস্ত্রি-মজুররা কেউ তার পেছনে লাগেনি।

—এইখানাই বার করা যাক—কেমন? ডাঃ প্রতুলচন্দ্র প্রস্তাব করেছেন।—ক্ষতি কি?

গাড়ীর ভেতরে কে কোন্ স্থান অধিকার করবে, তাই নিয়ে দু'জনেই একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করেচেন। প্রাণকেষ্ট জিগেস করেছে—আপনি তাহলে চালকের আসনে বসুন।

—না, না। আমি কেন? জবাব দিয়েচেন প্রতুলচন্দ্র—কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হয়েই, বলতে কি।

—আমিই চালাবো তাহলে? প্রাণকেষ্ট বলেছে: বেশ। আপনি আমার পাশে থাকচেন তো?

—তা, পাশাপাশি বসতে আপত্তি কি আমাদের? প্রতুলচন্দ্রের তাড়া দেখা গেছে এবার—চট্ করে বেরিয়ে পড়া যাক তাহলে। বাজে সময় নষ্ট করে লাভ কি?

—কোন্ দিকে যাবো? ড্রাইভারের আসনে বসে প্রশ্ন করেছে প্রাণকেষ্ট।

—রাস্তায় তো বেরনো যাক আগে তারপর হাওড়া ব্রিজ হয়ে—

—য়্যাঁ? একেবারে হাওড়া পর্যন্ত?

—নিশ্চয়। বলেচেন প্রতুলচন্দ্র: এমন কি তারও ওধারে—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যদ্দুর যাওয়া যায়। চালাতে শেখার সাথে সাথে যদি একটু হাওয়া খাওয়া যায় মন্দ কি?

গাড়ীতে স্টার্ট দিতেই ইঞ্জিনের পত্রপাঠ প্রত্যুত্তর পেয়ে প্রাণকেষ্ট চমৎকৃত—এরকম গাড়ী এর আগে সে পায় নি। হাতায়নিও এর আগে।

এক ছুটে বোঁ করে বেরিয়েছে গাড়ীটা। এত বড় গাড়ী, যার বনেট্‌টাই এতখানি, করায়ত্ত করা প্রাণকেষ্টর এই প্রথম। কিন্তু তাহলেও, একজন ওস্তাদ্ শিখিয়ের পাশে বসে চালানোয় তার ভয়টা কি?

—বাঃ, দিব্যি ফাঁকা রাস্তা! আরো একটু জোরে চালানো যায় না? প্রতুলচন্দ্রের প্রশ্ন।

—কতো জোরে চালাতে আপনি বলছেন?

—যতো জোরে চালানো যেতে পারে।

অদ্ভুত গাড়ী! অ্যাক্‌সিলিরেটরে পা ছোঁয়াতেই গাড়ীটা তীর বেগে ছুটেছে। একটা ঘোড়ার ল্যাজ ঘেঁষে চলে গেছে উল্কার মতো।

—চমৎকার চালানো। এক চুলের জন্যই বেঁচে গেছে ঘোড়াটা। চুলচেরা বিচার করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন ডাক্তার।

এই কৃতিত্ব সত্যিই ওর চালনা-নৈপুণ্য কি না, প্রাণকেষ্ট ভেবেছে। ভেবে একটু অবাক হয়েছে নিজেই।

—আবার কি ঐ রকম একটা কিছু করা যায় না?

—তা—চেষ্টা করলে—বোধ হয়—

—আমাদের সামনে ঐ—ঐ যে রেসিং-কার চলেছে দেখা যাচ্ছে—ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েরা চেপে ফুর্তি করে চলেছে—ওর একেবারে ধার দিয়ে—প্রায় দাড়ি কামানো গোছ চেঁছে দিয়ে যাওয়া যায় না? পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব জোরসে হর্ণ বাজিয়ে যেতে হবে কিন্তু?

প্রাণকেষ্ট সন্ত্রস্ত চোখে সঙ্গীর দিকে তাকালো। সঙ্গীন পরীক্ষাই বই কি!

কিন্তু নাচতে নেমে ঘোমটা রাখা যায় না। শিক্ষালাভ করতে এসে পরীক্ষার কালে প্রশ্নপত্রকে ফাঁকি দেওয়া চলে না!

রোসং-কারের দাড়ি চেঁছে যাবার সময় তার মনে হোলো, গাড়ীটা যেন শিস্ দিয়ে চলেছে—সেই সঙ্গে হর্ণের এমম কান ফাটানো আওয়াজ! আর সঙ্গে সঙ্গে ও-গাড়ীর হল্লাকারীদের কী বিচ্ছিরি চীৎকার। বাতাসে আর্তনাদটা গপ করে গিলে ফেলল, তাই রক্ষে; নইলে প্রাণকেষ্টর কান গেছল।

—তোফা! উল্লসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার। আচ্ছা, কতো তাড়াতাড়ি তুমি মোড় ঘোরাতে পারো? স্পীড একদম না কমিয়ে মোড় নিতে পারো না—অস্বাভাবিক উৎসাহে এমন কি তিনি স্বাভাবিক ভাববাচ্য পর্যন্ত ভুলে গেলেন। প্রাণকেষ্টর মৃত্যু আসন্ন জেনেই কিনা কে জানে!

—বলতে পারব না ঠিক—জবাব দিল প্রাণকেষ্ট।—কখনো চেষ্টা করিনি।

আচ্ছা, সামনের বাঁকটায় ঘোরো তো দেখি। যতো তাড়াতাড়ি পারা যায়।

প্রাণকেষ্টর হাত কাঁপতে থাকে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর। শিক্ষালাভ করতে হলে প্রাণপণ করতে হয়, এমন কি প্রাণ দিয়ে শিক্ষা পাওয়াটাই আসল শিক্ষা—প্রাণকেষ্টর তা অজানা নয়। 'রক্ত দিয়ে কী লিখিব—প্রাণ দিয়ে কী শিখিব—কী করিব কাজ?' রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই কলিও তার মনে পড়ে। কিন্তু তবুও তার হাত কাঁপে।

—তবে তাই হোক। তথাস্তু! মনে মনে নিজেকে এই কথা বলে প্রাণকেষ্ট মরিয়া হয়ে পড়ে। মোড়ের মুখের পথিকরা, গ্রহের চক্রান্তে সেই দণ্ডে যারা প্রায় মরবার মুখে ছিল, চীৎকার করে ওঠে—গাড়ীটাও এক ধারের দুটো চাকা স্বর্গের দিকে তুলে দেয়। কিন্তু তক্ষুনি আত্মসম্বরণ করে ভূমিষ্ট হয়ে নিজেকে সোজা করে নিতে সে দেরী করে না।

এই সুযোগে গাড়ীটা মোড়ের পাহারোলার ল্যাজ ঘেঁষে গেছিল।

ধনুষ্টঙ্কারের মতো বেঁকে আত্মরক্ষা করে সেও নিজেকে সোজা করে নিয়েছে।

অদ্ভুত! অদ্ভুত—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার।—বিলেতে যে সব মোটরের রেস হয়, তাতে আমাদের যোগ দেয়া উচিত।

—আপনি—আপনি কি সত্যি বলছেন? আমি—আমি কিন্তু কখনো সে কথা ভাবিনি। প্রাণকেষ্ট নিজেকে অভাবিত জ্ঞান করে।

আচ্ছা, এই যে সব গাড়ী ঘোড়া যাচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে রেখে এঁকে বেঁকে—যেমন করে ফুটবল কেয়ারি করে নিয়ে যায়, তেমনি করে এদের ভেতর দিয়ে যেতে পারো না তুমি?

—আপনি কি মনে করেন? পারব কি?

—তুমি সব পারো। ডাক্তার হাসতে থাকেন: 'আমার মনে হয়, তোমার অসাধ্য কিছু নেই।

অকস্মাৎ প্রাণকেষ্টরও মনে হয়, সে সব পারে। এতক্ষণ তাদের গাড়ী বড় রাস্তা দিয়ে ছুটছিল বটে, কিন্তু এবার আরো চওড়া রাস্তায় চড়াও হোলো। চারি ধারে গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, লরীর ছড়াছড়ি, ট্রাম যাচ্ছিল, আসছিল। প্রতুল ডাক্তার প্রাণকেষ্টর কানে কানে কী যেন বললেন। কানাকানি করবার মতই কথা বটে। এক মুহূর্তের জন্য প্রাণকেষ্ট ভয়ে জমে যেন জড় পদার্থ হয়ে গেল! তারপর বলল, কোন্ ধার দিয়ে যাব? যে ট্রাম যাচ্ছে তার ডান্ ধার দিয়ে, না কি, যে ট্রাম আসছে তার -

তা কেন? যা বললাম। দু'টো ট্রামের মাঝখান দিয়ে—তারা সামনা-সামনি এসে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে কেটে বেরিয়ে যাও।

প্রাণকেষ্ট ঠিক অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারে না।—কি রকম?

—আহা! এ ট্রামটা যাবে আর ও ট্রামটা আসবে—তারা মুখো-মুখি এসে পড়বার মুখে তাদের মাঝখান দিয়ে বন্দুকের গুলির মতো সোঁ করে গাড়ীটাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। সিকি সেকেণ্ডের

এদিক-ওদিক হলে দু'টো ট্রামের মাঝখানে পড়ে পিষে চ্যাপটা চকোলেট হয়ে যাব আমরা। এবার বুঝেচ ?

প্রাণকেষ্ট ঢোঁক গিলল। চরম পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে বুক বাঁধল সে। আশ-পাশের ট্রামের ঘর্ঘর ধ্বনি যেন রেলগাড়ীর শব্দের মতো মনে হতে লাগল তার। তার চোখের সামনে সব আবছা বলে বোধ হতে লাগল। তার ওস্তাদ্‌জী যদি অন্ততঃ তাঁর একটা হাতও স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাখতেন তাহলে সে যেন শান্তি পেত—নিশ্চিন্ত হতো একটু—কিন্তু না, তিনি তা রাখতে প্রস্তুত নন। অগত্যা প্রাণকেষ্টকে স্বহস্তেই সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। দু'ধারের ট্রামের আওয়াজ যেন বজ্রগর্জন বলে তার মনে হতে থাকে—মুহূর্তের জন্যই। তার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে সে চোখ বোজে।

অবশেষে চোখ খুলে—পার হয়েছি ? হতে পেরেছি ? এই কথাই প্রথম সে জিগেস করে।

ডাক্তার বলেন—সাবাস্

এতক্ষণে তারা হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে এসে পড়েছে—এর পর কি করব ? জিজ্ঞেস করে প্রাণকেষ্ট।

—কিছু না। ঝড়ের বেগে চালিয়ে যাও। হুকুম আসে

চল্লিশ—পঞ্চাশ—ষাট—সত্তর। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ফাঁকা রাস্তায় ঝড়ের বেগে গাড়ী চলেছে—স্পীডোমীটারে সত্তর মাইলের নিশানা।

—এরকম একজন পাকা ড্রাইভারের পাশে বসে যাবার সৌভাগ্য জীবনে একবারই হয়। ডাক্তার না বলে পারেন না।

—সত্যি বলছেন আপনি ? প্রাণকেষ্ট গদ্‌গদ্ হয়ে পড়ে।

—তোমার ব্রেকের খবর কি ? ব্রেক ঠিক আছে তো ?

—এখনো পরীক্ষা করে দেখা হয় নি।

আমি ভাবছিলাম কি—এই স্পীডের মাথায় যদি হঠাৎ তোমায় গাড়ী থামাতে হয়—সামনে কোনো বিপদ বা দুর্ঘটনা এসে পড়ে—তাহলে কি করবে ?

প্রাণকেষ্টর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কথাটা ভাববার মতো বই কি। তার শিরদাঁড়া দিয়ে যেন বরফের স্রোত ওঠা-নামা করতে থাকে।

—তা হলে কি করতে বলেন? ক্ষীণকণ্ঠে সে জিগেস করে। সে রকম অবস্থায় কি করব?

—মনে হচ্ছে, অদূরে যেন রাস্তাটা ব্লক্ করে দিয়েছে—একটা লরী লম্বালম্বী খাড়া করে রাস্তাটা যেন আটকে দেয়া হয়েছে মনে হচ্ছে। গাড়িটা থামাও তো এবার।

ডাক্তারের ধারণাই ঠিক! দেখতে দেখতে সেই লরীর বেড়া সামনে এসে পড়েছে; আর প্রাণকেষ্টও প্রাণপণে ব্রেক্ টিপেছে। চার চাকাতেই ব্রেক্ এঁটে গিয়ে— হঠাৎ বিশ্রী এক কেকাধ্বনী—এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাড়ীটাই কয়েক হাত লাফিয়ে উঠেছে আকাশে।

—যাক, বাঁচা গেল! বলেছেন ডাক্তার।

—আপনি যা বলেন! আমার কিন্তু বাঁচনের আশা একদম ছিল না। প্রাণকেষ্টও হাঁফ ছেড়েছে।

ঠিক পাশেই তার ওতোরপাড়ার থানা। সেখান থেকে দারোগা বেরিয়ে এসেছেন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে সন্দেহজনক এক মোটর গাড়ীর মারাত্মক গতিবিধির খবর একটু আগেই টেলিফোনে তাঁরা পেয়েছিলেন। রাস্তা আটকে ছিলেন তাঁরাই।

থানার দারোগা এসে প্রাণকেষ্টকে পাকড়ালেন—লাইসেন্স দেখাও।

—আমি ত সবে চালাতে শিখছি। লাইসেন্স কোথায় পাবো! প্রাণকেষ্ট বলেছে: উনিই তো মাস্টার। উনিই আমায় শেখাচ্ছেন।

আমি মাস্টার! তার মানে? তুমিই তো আমার মাস্টার হে! প্রতুলচন্দ্র অত্যন্ত প্রতিবাদ করেছেন। খুব শেখালে যাহোক!

—তার মানে? দারোগা এবার প্রতুল বাবুকে নিয়ে পড়েছেন: আপনার লাইসেন্স দেখান তো।

—আমার মেডিক্যাল লাইসেনস্— তার সঙ্গে গাড়ি চালানোর কি?

ডাক্তার প্রতুলচন্দ্র আকাশ থেকে আছাড় খান: এবং তাও তো আমার সঙ্গে নেই। আমাব রেজিস্টার্ড নম্বর বলতে পারি। তাতে কিছু সুবিধে হবে?

—কোথ্‌থেকে আসছেন আপনারা?

—ভবানীপুরেব এক মোটর গ্যারেজ থেকে।

—কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছেন?

প্রতুলচন্দ্র ঘড়ি দেখে কাঁটায় কাঁটায় বলে দেন—ঠিক সাড়ে চাব মিনিট আগে।

—ভবানীপুর থেকে ওতবপাড়া সাড়ে চার মিনিটে এসেছেন—ঘণ্টায় কতো মাইল বেগে এসেছেন, আপনাদের খেয়াল আছে? এই বেষ্ট্রিক্‌টেড্‌ এরিয়ায় এরূপ বে-আইনী গাড়ী চালানোব জন্য আপনাদের আমরা সোপর্দ করব

এমন সময় একটি যুবক দৌড়ে এসে হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল—

—এই যে · ডাক্তাব রায় ··কি ভাগ্যিস, আপনি এসে পড়েছেন। · এত তাড়াতাড়ি আপনি আসতে পারবেন, আমবা ভাবতে পারি নি। আপনাকে ফোন্‌ করবার পব থেকে এই ক'মিনিট যে কি কবে কাটছে আমাদের! মুখুজ্যে মশায়ের হার্ট ট্রাব্‌লটা হঠাৎ বড্ড বেড়ে উঠেছে—প্রায় যায় যায় অবস্থা। আসুন তাড়াতাড়ি। থানার পাশের দু'খানা বাড়ী বাদ দিয়ে ঐ বাড়ীটা আমাদেব।

শনিবাবের ট্রামে যা ভিড়। প্রাণকেষ্ট যদিও বুদ্ধি খরচ করে অনুকে আসতে বলেছিল, অফিস-ফেরতা এক সঙ্গে ফিরবে, কিন্তু তাব ফলে একটুও সুবিধে হোলো না, মেয়ে সঙ্গীর খাতিরে মহিলা আসনে বসবার পাসপোর্ট সে পেল না, অকৃত্রিম মেয়েদের দ্বারাই তা প্রায় ভর্তি হয়েছিল। একটু পরেই অবশ্য একটি মেয়ে উঠে যেতে প্রাণকেষ্ট অনিমার পাশে বসতে পেল।

আঃ, বাঁচলাম! হাঁপ ছেড়ে বলল ও: লোকে যে বলে পরের ওপর নির্ভর কোরো না, মানুষ হতে চাও তো নিজের পায়ে দাঁড়াও,—তার কি কোনো মানে হয়! বাব্‌বাঃ, যা ভিড়! এর মধ্যে পরের পা আলাদা রাখি কি করে? পরের পায়ে না দাঁড়ানো কি সোজা ব্যাপার রে দাদা? বলে কত লোক আমার পায়ে দাঁড়িয়ে গেল মজা করে—তার কি করছি?

কী বলছো? প্রাণকেষ্টর স্বগতোক্তি অনু শুনতে পায় না।

এই ভিড়ের কথাই বলছি। গাদাগাদির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘেমে নেয়ে প্রাণ যায়। ইস্, যতবার রুমাল বার করার চেষ্টা করছি অন্যের পকেটে হাত ঢুকে যাচ্ছে।

কী বলছ? অনু জিজ্ঞেস করে।

সত্যি ভারি অদ্ভুত কাণ্ড, সেই কথাই বলছি। প্রাণকেষ্ট বলে।

কী বললে? অনু জানতে চায়: কিসের অদ্ভুত কাণ্ড?

যেমন ভিড়—তেমনি গোলমাল ট্রামে। ভালো করে কিছু শোনাও যায় না।

এই পরের পকেটে হস্তক্ষেপ করা—ইচ্ছে এবং প্রয়োজন না থাকলেও। যারা পকেট মারতে ভালবাসে তারাও বোধ হয় এমন ঠাসাঠাসি পছন্দ করবে না। এ ধরণের গায়ে পড়া ভিড় তাদের নিশ্চয় দমিয়ে দেয়—আমি হলপ করে বলতে পারি।

তুমিই জানো। অনুর একবাক্যে সায়।

এক মিনিট অন্তর ট্রাম থামছে, কেনই বা থামছে কে জানে! একজনেরও তো নামবার নাম দেখিনে, সতের জন করে ঢুকছে তার ওপর। ঢুকছে তো, কিন্তু কোথায় যে সেঁধুচ্ছে খোদাই জানেন!

ট্রাম এবং ট্রামযাত্রী—উভয়ের গতিবিধির ব্যাপারে প্রাণকেষ্টকে ভারী খাপ্পা দেখা যায়।

কোথায় সেঁধুচ্ছে আমি কি তা জানতে চেয়েছি? অনুর বেখাপ্পা প্রশ্ন।

কিন্তু অনুর ঐ ধরণের প্রশ্ন প্রাণকেষ্টকে নিরুত্তর করে দেয়। ওর সমস্ত উর্মিমুখরতা যেন অভাবিত তুষারপাতে অকস্মাৎ জমে আসে। প্রাণকেষ্ট চুপ করে থাকে। সামনের আসনের লম্বাপানা এক ছোকরার ঘাড়ের দিকে অনু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

দেখেছ? অনু যুবকটির ঘাড়ের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

দেখেছি। কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে কোপ দেবার মতোন বটে। প্রাণকেষ্ট দস্তুরমত কোপান্বিত।

দেখে আমার মনে পড়ল। অনু জানায়: ভালো করে তাকিয়ে ছাখো না।

কী দেখব? প্রাণকেষ্টর বিষদৃষ্টি দেখা যায়—দেখছি তো, দেখবার কী আছে? অনুবোধের উত্তরে অনুযোগ না করে সে পারে না।

ভদ্রলোকের কানদুটো—একটু অদ্ভুত নয় কি? লক্ষ্য করেচ?

স্‌স্‌স্‌—! চুপ্‌! শুনতে পাবেন ভদ্রলোক।

ভালো করে তাকিয়ে দেখলে ভদ্রলোকের হাতলদুটি বেশ একটু বেমানান বলেই মনে হয় বটে, পঠদ্দশায় দারুণ গুরু-মশাই-সুলভ হওয়ার দরুণ কিনা বলা কঠিন। রাম-শ্যাম-যদুরা যে ধরণের কান সচরাচর ব্যবহার করে, এ দুটি তার চেয়ে একটু বড় মাপের। এতাদৃশ লম্বা-চৌড়া কানের বোঝা ঘাড়ে বয়ে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না, সে কথা ঠিক, কিন্তু কান তো এখন অবধি লোকের নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যেই সাব্যস্ত? কানের ওপরে সরকার এখনো কোনো ট্যাক্‌সো বসাননি। যদিও অদূর ভবিষ্যতে বসাবেন কিনা এখনকার দিনে সেকথা জোর করে বলা খুব শক্ত; তাহলেও, কানকেষ্টর দিকে তাকিয়ে প্রাণকেষ্ট, দৃশ্যটির যতই খুঁৎ থাক্‌, খুঁৎ খুঁৎ করার কোনো কারণ পায় না।

দেখে কী মনে হচ্ছে? জিজ্ঞেস করে অনিমা।

কী মনে হবে? প্রাণকেষ্ট বলে। মনে হওয়া-হওয়ির কী আছে?

রবিবারের খবরের কাগজের একটা ছবির কথা আমার মনে পড়ছে,—অনু প্রকাশ করে। কিসের ছবি বলো দেখি?

আমি কি করে জানব?

খরগোসের। খবর দেয় অনু।

খরগোস?

এখন এই ভদ্রলোকের কান দেখে মনে পড়ল। কিন্তু তখনিই, সেই ছবি দেখেই আমি এঁচে রেখেছিলাম, কয়েকটা খরগোস আমাদের—চাইই—না হলেই নয়।

তাই নাকি? প্রাণকেষ্ট হাপ ছাড়ে।

খরগোসের ছানা পোষাব—এখন থেকেই ছাপোষা হবার কিছু মাত্র উৎসাহ যে ওর নেই, এই কথাই প্রাণকেষ্ট প্রতিবাদ-ছলে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নামবার জায়গা এসে পড়ায় তাকে থামতে হোলো। কিন্তু নামবার পরেও অনু থামল না। বাড়ী অবধি সারা পথ খরগোসের রূপগুণের ব্যাখ্যা করতে করতে চলল।

প্রাণকেষ্ট চুপ করে চলেছে, কথা বাড়ায় নি। কী থেকে কিসে গড়ায়, কিছুর ঠিক নেই। রবিবারের কাগজ থেকে ভদ্রলোকের কান, তার থেকে এখন কোথায় এসে হাজির! এক্ষুনি আবার খরমুজ পেলেই হয়তো খরগোসকে ভুলে যাবে।

কিন্তু পরের রবিবারে অনুদের বাড়ী গিয়েই চোখে পড়ল খাঁচার মধ্যে আনকোরা একজোড়া খরগোস! আর অনুর উৎসাহ ছাখে কে!

উত্তেজিত অনু একতলার থেকে টানতে টানতে চিল-কোঠায় খরগোসের খাঁচার কাছে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

এই—এই! করচ কি? জামা ছিঁড়ে যাবে যে। প্রাণকেষ্ট বিব্রত হয়ে পড়ে। কিন্তু অনুর কোনো হুঁস নেই! কে বলছে—কেই বা শোনে?

আহা দেখেচ। কী সুন্দর, দ্যাখো দ্যাখো। অনু দেখতে দেখতে উছলে উঠে: তোমার সারা জীবনে এমন একজোড়া দেখেচো কখনো? আমি তো দেখিনি।

প্রাণকেষ্ট যে কখনো দ্যাখেনি, তা মিথ্যে নয়। ওরা যে দর্শনীয়ের মধ্যে গণ্য, তাও তার মনে হয় না।

মাত্র বারো টাকা সাড়ে ছ আনা! অনু বলতে থাকে: কেবল তাতেই খরগোস দুটো অমনি আমায় দিয়ে দিল। অমনি ছাড়া কি বারো টাকা সাড়ে ছ' আনা কি আবার একটা দাম নাকি?—কেমন, লাভ করিনি খুব? এখন, বলো দেখি, এদের দুজনের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ?

অগত্যা, বারো টাকা সাড়ে ছ' আনার বাহুল্যে বিনামূল্যে প্রাপ্ত খরগোসদের সম্মুখে একটা বালতি উপুড় করে প্রাণকেষ্টকে বসতে হয়।

বড্ড ছেলেমানুষ। এখনো কোনো জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি এদের অনু বাৎলায়।

তা বটে! সংসারকে চিনতে শেখেনি এখনো! প্রাণকেষ্ট বলে। তা বেশ, এখন যখন আমাদের পরিচয় হয়ে গেল তখন আর আলাপ জমাতে দেরি কি? তুমি রান্নাঘরের খবর নাও গে, আমি ততক্ষণ দেখি এদের।

কী দেখবে শুনি: প্রাণকেষ্টর বলার ধরণে ওর খটকা লাগে।

মানে, সংসারকে এদের চেনানো যায় কি না দেখা যাক।

তার অর্থ?

তার অর্থ অচিরে স্যাণ্ডউইচের মধ্যেই টের পাবে।

য়্যাঁ—য়্যাঁ—কী বললে? আর্তনাদ করে ওঠে অনিমা।

কী হোলো? অনুর চীৎকারে ও চমকে ওঠে। হোলো কি?

কী বললে তুমি? তুমি—য়্যাতো নিষ্ঠুর হতে পারো? এই ননীর পুতলি দুটোকে—প্রাণ ধরে—উঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর। উঃ অনু ওর বেশি আর কিছু বলতে পারে না।

অতো কেন ভাবছো তুমি? এমন করে আমি কাজ সারবো যে ওরা টেরও পাবে না। একটুও লাগবে না ওদের। প্রাণকেষ্ট আশ্বাস দেয়: তুমি নির্ভয়ে আমার হাতে ছেড়ে যেতে পারো।

ছেড়ে যাবো? তোমার হাতে? অনু গজরে ওঠে। আর আমার চোখের আড়ালে তুমি ওদের ধরে খুন করবে? ইস্! কি করে যে তুমি বলতে পারলে আমি তাই ভাবছি।

কিন্তু—

এক্ষুনি তুমি আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও। আমি এ জীবনে আর তোমার মুখ দেখব না।

একথা মন্দ নয়। প্রাণকেষ্ট বললে: কিন্তু দেখো, যেন একলা একলা মুখে তুলো না। ওদের অন্ত্যেষ্টির দিনে আমি যেন খবরটা পাই। শ্রাদ্ধের ভোজে বাদ যাইনে যেন।

আশ্চর্য! কি করে যে ভাবতে পারো। অনু গালে হাত দিয়ে বলে: ওদের আমি প্রাণ ধরে কখনো গালে হাত পুরতে পারি. একথাটা ভাবাই যে ভয়ানক। ওদের আমি কতো ভালোবাসি তা তুমি জানো? ওদের এক গরাস মুখে তুলতে গেলে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে। বলতে বলতে ওর চোখে জল এসে পড়ে।

জল প্রাণকেষ্টরও এসেছিল, তবে চোখে নয়, অন্যত্র। জিভের তলাঞ্জলি দিয়ে খরগোস-স্যাণ্ডউইচের স্বপ্ন দেখছিল সে। কিন্তু জিনিসটা এমন, স্বপ্নে ঠিক দেখা যায় না—চোখে দেখলেই ঠিক হয়।

কয়েক রবিবার কেটে গেছে তারপর। অনু আর একদিন প্রাণকেষ্টকে নিতে এসেছে আপিস থেকে।

একি! গলায় তোমার ওটা কি? এ যে মহারাণীর মতো সেজে এসেছ! অনুর পরিপাট্যে প্রাণকেষ্ট চমৎকৃত।

এ তো আমার গত বছরের লেডিজ কোটটা, তুমি ধরতে পারছো না? কেবল এর কলারের কাছটা চামড়া দিয়ে তৈরি—কিসের চামড়া বলো দেখি? অনু জিগ্যেস করে।

কি করে বলবো? হরিণের চামড়া হয়তো! তাই না?

হোলো না, হোলো না। হরিণের কি এত সুন্দর আর এমন লম্বা লম্বা রোঁয়া হয়? হরিণকে আর এমন চামড়া পেতে হয় না।

হরিণের না হলে বাঘ, ভল্লুক, গণ্ডার—আর কার হতে পারে প্রাণকেষ্ট ঠাওর পায় না। তার নিজের চামড়া নয় এইটুকু জেনেই সে আপ্যায়িত।

আমার·····আমার সেই—আমার সেই খরগোসের····· অনু আস্তে আস্তে ভাঙে।

য়্যাঁ? তুমি—তুমি বলেছিলে না যে—

বলেছিলাম ঠিক। বলেছিলাম যে ওদের আমি ভালোবাসি। সে কথা আমার মিথ্যে নয়। অনুর গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে: তাইতো ওদের স্মৃতিচিহ্ন আমার বুকের ওপর জড়িয়ে রাখলাম। কোনোদিন কি ওদের কথা আমি ভুলতে পারব—তুমি ভাবো? আহা, কী মিষ্টিই যে ওরা ছিল!

য়্যাঁ—চেখেও দেখেছ নাকি? প্রাণকেষ্ট অবাক আরো: কেবল গলদেশেই নয়, গলার তলদেশেও ঠাঁই দিয়েছো বুঝি?

পাগল? তা কখনো পারা যায়? য়্যাতোদিন ধরে য়্যাতো ভালোবাসার পর? আমি কি মানুষখেকো নাকি? বলেছিলাম না যে, ওদের এক গ্রাসও আমি মুখে তুলতে পারব না? পারলামও না। মা খুব ভালো করেই রেঁধেছিলেন—কী চমৎকার গন্ধ যে বেরিয়েছিল। কিন্তু মুখে তুলতে গিয়ে আমার চোখে জল এসে গেল।

আহা, বেচারীরা! প্রাণকেষ্টর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। ভালোবাসা এমনই মারাত্মক যে, তার ছোঁয়াচ পাত্রা-পাত্র বিচার করে না। খাদ্য-খাদকের ভেদ বিলোপ করে। এক থেকে অন্যে গড়ায়।

পাশের বাড়ির মেয়েটি আমার বন্ধু। তাকে ডেকে এনে খাইয়ে দিলাম। তার খরগোসের চামড়ার কোটটা দেখেই জামার আইডিয়াটা আমার এসেছিল কি না?

ফিরিওয়ালার অত্যাচারে ফেরারীই হতে হয় বুঝি। কলকাতার দাক্ষিণাত্য—বালিগঞ্জে এসেও নিস্তার নেই। উত্তরা পথে যাদের শুধু হাঁকডাকই শোনা যেত—রকম বেরকমের সুরে আর ব্যঞ্জনায় এবং তাতেই ত্রাহি ত্রাহি ছিল, এখানে তারা ভদ্রবেশ ধরে বাড়ীর ভেতরে এসে হামলা দেয়। উপরচড়াও হয়ে ঝামেলা করে। দূরের বিকটাসুররা এখানে নিকট। কানের কাছের থেকেও আরো কাছে মূর্তিমান হয়ে চোখের সামনে আরো চোখা হয়ে হাজির। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে নিজমূর্তিতে প্রকট—এখানে তাদের ক্যান্‌ভাসাররূপ। এবং এখানেও তারা তেমনি মুহুর্মুহু। আর তদ্রূপ দয়ামায়াহীন। চোখাচোখি হলেই মুখোমুখি এবং—তারপরে, হয়তো বা হাতাহাতি কাণ্ডই এবং।

খবরের কাগজের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে প্রাণকেষ্ট। কী পড়চ এত? জিজ্ঞেস করল অনিমা।

একটা নতুন খবর—

নতুন খবর? কী এমন নতুন খবর শুনি?

একজন লোক বিজ্ঞাপন দিয়েছে—

বিজ্ঞাপন? অনিমার নির্মল মুখে বিকার দেখা গেল: বিজ্ঞাপন কি আবার একটা খবর নাকি?

তাহলে কি খবর—তোমার ঐ যুদ্ধ? সে তো কালকেও যা বেরিয়েছে আজকেও তাই— আবার কাল-পরশুও অবিকল সেই একই খবর পাবে। তারিখ পালটানা একটানা একঘেয়ে ব্যাপার—তার মধ্যে নতুনত্ব কী আছে? ওকেই বরং বিজ্ঞাপন বলতে পারো। ওর চেয়ে বিজ্ঞাপনের মধ্যে অনেক নতুন খবর থাকে— অনেক জানবার জিনিস আর অজানা জিনিস জানা যায়—তা জানো? তাছাড়া, পড়তেও বেশ।

তোমার মাথা! তোমার মত বোকাদের ঠকাবার জন্যেই

বিজ্ঞাপনের ফাঁদ পাতা হয়, তা বোঝ? বিজ্ঞাপনের কথায় ভুলে তোমরা যাতে—

যা পড়ছিলাম সেটা সে রকমের বিজ্ঞাপন না। খুব দরকারী —অবশ্যজ্ঞাতব্য একটা খবর! প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। ইঁদুর ধরবার আশ্চর্য এক কল—

ইঁদুর নয়, তোমাকে ধরবার জন্য। অনু বাধা দিল: বেছে বেছে আমাদের এই ধেড়ে ইঁদুরটিকে ধরবার এক কল বের করেছে তা কি আমি আর জানিনে?

প্রাণকেষ্ট মুষড়ে পড়ে। ইঁদুরের চেয়েও ওকে বেশি ম্রিয়মান দেখা যায়।

সেই মুহূর্তে বাইরের কড়াটা নড়ে উঠল হঠাৎ। কড়া আওয়াজ শোনা গেল দরজার।

একটু কর্কশধ্বনি করেই দরজাটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। এবং তার উন্মুক্ত পথে প্রবেশ লাভ করে অত্যন্ত পরিচিতের মতো আপ্যায়িত-করা-হাসি হেসে—অনিমাকে সম্বোধন করে এগিয়ে এসেছে এক অভিব্যক্তি।

নমস্কার গিন্নীমা—

দরকার নেই। বলল অনিমা। সম্বোধনে প্রথমা হয়েই সে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিতে চায়।

নতুন ডিজাইনেই ভালো ভালো—তবুও সে লোকটা বলতে ছাড়ে না।

কোনো দরকার নেই। আরম্ভর সূচনাতেই তার আড়ম্বর থামাতে চায় অনু।

খুব পছন্দসই কতকগুলো জিনিস এনেছিলাম। আদৌ দমবার পাত্র নয় আগন্তুক।

একদম্ দরকার নেই—বলছিনে? সেও যেমন মরীয়া, অনিমারও তেমনি মার মূর্তি।

যদি দেখতেন একবারটি দয়া করে। এমন সব জিনিস এত সস্তায় এর পরে আর পাবেন না।

পেতেও চাইনে। একেবারেই দরকার নেই আমাদের। তুমি অন্য বাড়ী ছাখো বাপু। দৃঢ়স্বরে এই বলে অনু ততোধিক দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে, মাছি তাড়ানোর মতই লোকটাকে ভাগিয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে এল!

প্রাণকেষ্ট এতক্ষণ বিস্মিত নেত্রে অনিমার ক্রিয়াকলাপ দেখছিল। ওর শক্তিমত্তায় একটু ঈর্ষাও বোধ করছিল বুঝি। সপ্রশংস গলায় সে গলে পড়ল এবার:

তুমি বাহাদুর বটে অনু।

ওদের সঙ্গে এ ছাড়া আর অন্য কোনো ব্যাভার নেই। ও পাড়ায় কেবল কানের মাথা খেতো—এ পাড়ায় ভোল বদলে চোখে ধুলো দিতে আসে।

বলেছ ঠিক। কিন্তু আমি বোধ হয় এতটা কঠোর হতে পারতুম না।

তাই তো ভুলিয়ে ভালিয়ে যত রাজ্যের ভ্যাজাল সব গছিয়ে যায় তোমায়। সেদিন এমন এক মুগো কিনলে—ক্ষোভে অনিমার গলা জড়িয়ে আসে।

বাস্তবিক, সে দুঃখ ফুরোবার নয়। আড়াই টাকা গজের মুগা, এক আধ গজ নয়—পুরো এক থান—এক ধোপেই ছোলা হয়ে দাঁড়ালো। কাপড়ের সর্বাঙ্গে চাকা গুটি বেরিয়ে গেল—এমন চাকচিক্য যে, তার দিকে তাকানোই যায় না। বসন্ত-লাঞ্ছন সেই বুটিদার চেহারা দেখলে তাক্ লাগে। তার শার্ট পরে প্রাণকেষ্ট বাড়ীর বাইরে বেরুতে পারে না, আর ব্লাউজ গায়ে দিয়ে ঘরের মধ্যেও অনিমা লজ্জায় ঘেমে ওঠে!

মুগার কথা আর বোলো না। প্রাণকেষ্ট সকাতরে বলে।

মুগার কথা আর বলে না অনিমা। এখন আর বলে না। আপাততর মতন ক্ষান্ত দেয়।

আমি সেলাইটা শেষ করিগে। তুমি ততক্ষণ বসে বসে কাগজ পড়বে তো এখানে? ফের যদি কোনো হতভাগা এখানে মরতে আসে, ফেরি করতে আসে কিছু, হাঁকিয়ে দিতে দেরি কোরো না। বুঝেছ?

প্রাণকেষ্টও বুঝেছে, আব তার একটু পরেই বোঝা হাতে আর একজন হাজির।

আপনার বন্ধু চৌধুরীমশাইয়ের কাছ থেকে আসচি। আপনি —আপনিই কি—?

"হ্যাঁ, আমিই শ্রীপ্রাণকেষ্ট পতিতুণ্ডি। আমাব বন্ধু চৌধুরী মশাই?—প্রাণকেষ্ট একটু বিস্মিত হয়েই বন্ধুবর চৌধুরী মশাইকে স্মরণ করার চেষ্টা করে। কে—চৌধুরী মশাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিই আমাকে আপনাব খবর দিলেন। বললেন আমার বন্ধুর উপকারটা তাহলে করুন, এই কথা বললেন তিনি।

উপকারের কথা শুনে বন্ধুকে স্মরণ করার দুশ্চেষ্টা প্রাণকেষ্ট ছেড়ে দিল: কী? কিসের উপকার?

আজ্ঞে, চেহারার উপকার। সেটাই কি কম কথা? আজকেব দিনে অন্যান্য নানান সমস্যার মতো চেহারা ভালো রাখাও কি একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি মশাই?

তাই নাকি? অবাক হয়ে গেল প্রাণকেষ্ট।

মুখের থেকেই সুরু করুন না! দাড়ি যে ভালো চেহার'র একটা বিরাট অন্তরায়, এটা তো আপনি মানবেন? অথচ নিয়মিতভাবে না কামালে দাড়ি আপনা থেকেই বাড়বে, বাড়বে নাকি?

বাড়বে বই কি! সায় দেয় প্রাণকেষ্ট: টাকা না কামালে বাড়ে না, কিন্তু দাড়ি না কামালেই বাড়ে।

ঠিক বলেছেন। লোকটি বলে: কিন্তু দাড়ি তো কামাবেন,

কিন্তু নিয়মিতভাবে কামাতে হলে ব্লেড চাই। সেই ব্লেড পাচ্ছেন কোথায়।

পাচ্ছি না তো। কামাচ্ছিও না। প্রাণকেষ্ট নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেখালো। হাতে হাতেই প্রমাণ।

তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু দেখে কোনো সুখ নেই। দাড়ি কেবল মুনি ঋষিদেরই শোভা পায়। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শোভা পেত। আপনি কি ঋষিত্ব পেতে চান? রবীন্দ্রনাথ হবার অভিলাষী?

না, না, কক্ষনো না, কক্ষনো না। প্রাণকেষ্টর ভীষণ আপত্তি দেখা যায়।

তবে? তবে দাড়ি কেন? আমাদের ব্লেডের দ্বারা কামাতে আরম্ভ করুন। কামিয়ে ফেলুন পত্রপাঠ। এ-ব্লেডে যাঁরাই কামিয়েছেন তাঁরাই কিরূপ আরাম পেয়েছেন, নিজমুখেই তার গুণগান করে গেছেন। মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন, এমন কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত! তাঁদের প্রশংসাপত্র আপনি দেখতে চান?

আপনার ব্লেড, তার মানে? প্রাণকেষ্ট বাধা দিয়ে জানতে চায়।

আমাদের তৈরি স্বদেশী ব্লেড। আপনার বন্ধু চৌধুরী মশায়ের ধারণা, নিয়মিত দাড়ি না কামিয়ে আপনি ভারী খারাপ হয়ে গেছেন। অবিলম্বেই কামানো আপনার পক্ষে নাকি অত্যাবশ্যক। আর, এই ব্লেড ব্যাভার করলে আপনি অতিশয় উপকার লাভ করবেন! এইজন্যই তিনি আমাকে আপনার ঠিকানা দিলেন। আমাদের এই ব্লেড—বাজারে এর তুলনা নেই।

কিন্তু না কামিয়ে তো আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। প্রাণকেষ্ট জানায়।

কষ্ট আমাদের। কষ্ট চৌধুরী মহাশয়ের। আপনার বন্ধুবান্ধবদের কষ্ট। মানে, যাঁদের আপনার মুখদর্শন করতে হয়—উঠতে বসতে আপনাকে দেখতে হয়ে থাকে—

প্রাণকেষ্ট আর সহ্য করতে পারে না, তাড়াতাড়ি বলে : আচ্ছা, দাও তাহলে এক ডজন, দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাও। গিন্নী এসে পড়তে পারে।

বেশি বলতে হয় না। বারোখানা ব্লেড, প্রত্যেকটা আট আনা হিসেবে ছ' টাকা, কেবল চৌধুরী মশায়ের খাতিরে এক টাকা কমে, নামমাত্র পাঁচ টাকা দামে দান করে ব্লেড সরবরাহকারী চক্ষের পলকে সরে পড়ে।

পাঁচ পাঁচটা টাকা, জলে ঠিক নয়, দাড়িতে ফেলে দিলাম। অনু কী বলবে কে জানে! অণুমাত্র ভাবনায় ভাবিত হয়ে প্রাণকেষ্টকে বিচলিত হতে হয়। নাঃ, সদব ঘরে বসে থাকলেই বিপদ। এক্ষুনি কোন্ মজুমদার মহাশয়ের প্রেরিত কে আবার এসে পড়বে হয়তো। মজা করে আর কিছু গছিয়ে আরো কিছু খসিয়ে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে পড়াই শ্রেয়ঃ। ফিরিওয়ালা সামলানো সহজ কর্ম নয়, সবার কম্মো না, অনুই পারে কেবল, আর যার কর্ম তাকেই সাজে, অন্য সবার পক্ষে তা সাজা ছাড়া আর কিছু নয়

প্রাণকেষ্ট লোকটার পেছনে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরতেই অনুর মুখোমুখি পড়ে যায়।

উঃ, লোকটাকে ভাগাতে এত সময় লাগলো তোমার। তবু তাড়াতে পেরেচ যে তাই রক্ষে! কথা শেষ হচ্ছে না দেখে ভাবলাম, লোকটা বুঝি তোমাকে শেষ করেই যাবে। তাই তাড়াতাড়ি···কি ···ও কি—কি···হ্যাঁগা·· লুকোচ্চো কি? তোমার হাতে কি গা?

ওঃ··অনু! আমি ভেবেছিলাম সেলাই করতে করতে তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ! অপরাধীর সুরে বোকার মতো প্রাণকেষ্ট সুরু করে।

কী কিনেচ দেখি। অনু এগিয়ে আসে। প্রসঙ্গান্তরে যাবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখা যায় না।

কী আবার কিনব! এই সামান্য—এই ক'খানা ব্লেড—লোকটা বলল, এর দ্বারা আমার চেহারার নাকি যারপরনাই উন্নতি হবে। বিলিতি ব্লেড তো আজকাল মিলচে না সেই বিবেচনায় দামও খুব বেশি নয়—এক ডজন মাত্র পাঁচ টাকা।

মাত্র পাঁচ টাকা? অনুর কণ্ঠস্বর মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বুঝি। পাঁচ টাকা···মাত্র? এধারে খেটে খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেল, পুরণো ব্লাউজ সেলাই করে জোড়াতালি দিয়ে পরতে হচ্চে আমায় গয়লার দুধের দাম বাকী, লাইফ ইন্সিওরের টাকা দেয়া হয়নি—আর তুমি কিনা এদিকে মনের সুখে নিজের চেহারা বাগাচ্ছো? বলি কে তোমায় দেখবে শুনি? পাঁচ পাঁচ টাকা জলে দিয়ে ময়ূরপুচ্ছ কাক না সাজলে শোভার খোলতাই হচ্চিল না তোমার?

এহেন ঝাপটার সামনে প্রাণকেষ্ট আর দাঁড়াতে পারে না। পুচ্ছসংগ্রহ নয়, পুচ্ছকে তাড়িয়ে তুচ্ছ করতেই চেয়েছিল ও। বাড়ী ছেড়ে তাড়াতাড়ি সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

প্রাণকেষ্ট চলে গেলে অনু হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর গাল থেকে হাত নামিয়ে সেলায়ে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে এমন সময়ে প্রাণকেষ্ট-পরিত্যক্ত মুক্তদ্বারপথে আরেকজনের আবির্ভাব হয়।

আরেক তৃতীয় ব্যক্তি। আজকের সুপ্রভাতের তৃতীয় আরেক আবির্ভাব। লম্বা মিশকালো ছুঁচোলো গোঁফওয়ালা একজন।

আমাদের কিছু কেনবার দরকার নেই আজ। অনু জানায়। প্রথম দর্শনেই জানিয়ে দেয়।

আপনি ভুল করছেন। আমি কোনো জিনিস বেচতে আসিনি। আপনিই কি শ্রীমতী পতিতুণ্ডি, আমার ভুল হচ্ছে না বোধ হয়? সেই তৃতীয় ব্যক্তির জিজ্ঞাস্য জানা যায়।

হ্যাঁ। বেচারাম নয় জেনেও বেচারার ওপর অনুর অণুমাত্র সহানুভূতি জাগে না।

আমি আপিস থেকে আসচি। অ্যাটার্ণির আপিস থেকে। আপনার ঠাকুরদার ভাই—মানে, আপনার খুড়তুত ঠাকুরদা—হরিমোহন রায়কে আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন তিনি। তাঁর সাম্প্রতিক পরলোক গমনের সংবাদ আপনাদের কাছে পৌঁছয়নি বলেই মনে হচ্ছে?

কই না—আমি—আমরা তো কিছু শুনিনি।

তাঁকে এখন ভালো করে আপনার মনে পড়ে না বোধ হয়?

সত্যি বলতে আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছিনে।

আশ্চর্য নয়। এমন কি, মনে পড়াটাই আশ্চর্য। আপনার অতি শৈশবে, হয়ত আপনার জন্মাবার আগেই তিনি বর্মায় চলে যান। সেখানে কাঠের ব্যবসা ফেঁদে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন—সেই সম্পত্তির সমস্তই—প্রায় দেড় লক্ষ টাকা—আপনাকে তিনি দিয়ে গেছেন!

অন্তর পরমাণুতে গিয়ে যেন ধাক্কা লাগে—বিদ্যুৎঝলকের মতই তীক্ষ্ণ—তীব্র আঘাত! এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—

ও—হ্যাঁ। মনে পড়েছে বটে। আমার হরিদাদুর কথা একটু একটু মনে পড়ে বইকি! বাবাকেই বলতে শুনেছি কতবার। আমাকে তিনি বড্ড ভালোবাসতেন।

বর্মাতে তিনি দেহ রাখলেও তাঁর নগদ টাকার অধিকাংশই তাঁর কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেন—জাপানীরা আসবার আগেই। এই যা রক্ষে! যাতে বেশী হাঙ্গামা না করে টাকাটা আপনার হাতে পড়ে, তার সব ব্যবস্থাই আমাদের অপিস থেকে করা হবে। আমরাই তাঁর একমাত্র এটর্ণি ছিলাম—আর আপনিই তো তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক মাত্র ওয়ারিশ—তাঁর উইলের মর্ম থেকে যদ্দূর জানা গেছে। এখন আপনাকে করতে হবে কি, এই ডকুমেন্টে টিকিটের উপর একটা সই করে দিতে হবে এবং দিন কয়েকের মধ্যে আমাদের আপিসে আপনাকে যেতে হবে একটিবার।

রেজেষ্ট্রী অপিসে যাবার প্রয়োজন হবে কিনা। আশা করি, আপনার খুব অসুবিধা হবে না এর জন্যে ?

না--না অসুবিধা কি ? এতো সুখের কথাই। অনু সই-করবার জন্যে তৈরি।

হ্যাঁ, এইখানে।—দেখি, বাঃ, দিব্যি সই হয়েছে। এইবার রেজেষ্ট্রী করার ষ্ট্যাম্প খরচা বাবদে কুড়ি টাকা আপনাকে দিতে হবে। আর এক টাকা মহুরী ফি, সই করার সাথে সাথেই ওটা দেয়—জানেন বোধ হয় ?

তা আর জানিনে ? নিশ্চয় জানি। অনু এক গাল হেসে জানায় : অ্যাটর্ণি-ফি যে দিতে হয় তা কে না জানে ?

তাহলে টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি—ভদ্রলোকের তাড়া দেখা যায়।

অনু হেসে বলে, এক্ষুনি আমি এনে দিচ্ছি আপনাকে। বসুন। যাতে রেজেষ্ট্রী করার হাঙ্গামাগুলো চটপট চুকে যায়, আপনাদের আপিস থেকে আশা করি দয়া করে সেটা—

না না। এতে দয়া করাকরির কী আছে ? আমাদের কর্তব্যই হোলো এই। রামের সম্পত্তি শ্যামকে দেওয়া, এই তো আমাদের কাজ। আপনাকে দেড় লক্ষ্য টাকা ধরে দিতে আমাদের কোন দুঃখ নেই, যত শীঘ্র দিতে পারি ততই ভালো, কেবল আমাদের অফিসিয়াল প্রাপ্য একুশ টাকা নিয়েই আমরা খুসি।

না না, এ কথা কেন বলছেন ? পরে আপনাদের আমি আরও খুসি করে দেব। অনু বাধা দিয়ে বলে।

ভদ্রলোক কিন্তু ততোধিক বাধা দেন : না না, সে কথা বলবেন না। অন্যায় হবে। জুলুম করা হবে। বে-আইনি কোনো অর্থ নিতে আমরা অত্যন্ত অপারগ জানবেন। ভগবানের দয়ায় আইনমতই আমরা যা পেয়ে থাকি, চুরি ডাকাতি রাহাজানি করেও তার বেশি পাওয়া যায় না।

আপনি একটু দাঁড়ান, টাকাটা আমি নিয়ে আসি।

অমুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকেষ্টর প্রাদুর্ভাব হয়। সে প্রস্তুত হয়েই ফিরেছে এবার। এর পর অদূর ভবিষ্যতে কোনো একটা ফেরি-ওয়ালাকে ফের একবার বাড়ীর চৌহদ্দির ভেতর পেলে হয়। তাকে উচিত মতো শিক্ষা দিতে একমুহূর্ত তার বিলম্ব হবে না।

আর মেঘ না চাইতেই জল। দরজা ঠেলে ঢুকতেই আস্ত একজন মূর্তিমানকে দণ্ডায়মান দেখা যায়। ভদ্রবেশী ফেরিওয়ালা ছাড়া আর কি?

মাপ করতে হবে মশায়। দয়া করে সরে পড়ুন দিকি। আমার কিংবা আমার পত্নীর পার্থিব বা অপার্থিব কোনো পদার্থে বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। আপনাকে সাফ কথা বলে দিচ্ছি শুনুন। এই বলে সেই ছদ্মবেশী ফেরিওয়ালাকে সে সাফ করতে চায়।

আপনিই বোধহয় প্রাণকেষ্ট পতিতুণ্ডি। তাই না?

তাড়া খেয়েও ভদ্রলোক খাড়া থাকেন।

ঠিক তাই। আমার নামের প্রতি আপনার এত মোহ কেন তা তো আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না এবং সেটা আমি ভালও বোধ করছি না। এই দণ্ডেই এখান থেকে চলে যেতে আপনাকে আমি সবিনয়ে সানুনয় অনুরোধ জানাই।

কিন্তু প্রাণকেষ্টবাবু, আপনার স্ত্রীর ঠাকুরদা—মানে—ঠাকুরদার ভাই—

ঠাকুরদার ভাই? ও রকম কোনো ভদ্রলোকের অস্তিত্বের কথা তো কোনোদিন শুনিনি আমার স্ত্রীর কাছে। আপনি দয়া করে আপনার পথ দেখবেন? প্রাণকেষ্ট রেগেমেগে এগোয়।

আপনার পত্নীর ঠাকুরদা ছিল না—আপনি বলচেন কি?—তথাপি ভদ্রলোক বলতে চেষ্টা করেন।

ঠিকই বলছি। প্রাণকেষ্ট সোজাসুজি বলে: আমার পত্নীর তিনকুলে কেউ ছিল না, এবং আমারও নয়। আপনি স্বেচ্ছায় যাবেন

না কি, আমাকে বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করতে হবে ?

আপনার ভাগ্য ফেরাতেই আমি এসেছিলাম,—কিন্তু আপনি ভুল বুঝে—ভদ্রলোক ভারী হতাশ হয়ে পড়েন শেষটায়।

ভাগ্য ফেরাতে ? চেহারা ফেরাতে নয় ? আমার দুর্ভাগ্য ! প্রাণকেষ্ট আর অধিক বাক্যব্যয় না করে প্রাণপণ কঠোরতায় একরকম ধাক্কা দিতে দিতেই লোকটিকে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। সদরে খিল এঁটে দিয়ে প্রত্যাবৃত্ত অনুর প্রতি সগর্বে সে ফিরে তাকায় : কেমন ? কি রকম তাড়িয়ে দিলাম ? আমি নাকি শক্ত হতে পারিনা ? দেখলে তো এবার ?

তাড়িয়ে দিলে ? কী সর্বনাশ ! করেছ কি তুমি ?

কেন, কি করলাম আবার ! একটা বাজে লোক ধাপ্পা মেরে আমাদের ভাগ্য বদলাতে এসেছিল—এক নম্বরের জোচ্চোর—কথা শুনলেই তো বোঝা যায়—

হায় হায়, কোথায় গেল, ঠিকানা-টিকানা কিছুই দিয়ে যায় নি যে !···আর কি ও ফিরবে ?

যাতে আর না ফেরে—এ পথ না মাড়ায় আর—তার দাবাই দিয়ে দিয়েছি। কাবুলি দাবাই—

তোমার কি এক ফোঁটা বুদ্ধি হবে না কোনোদিন ? আমার ঠাকুরদা—হরিদাদুর উইল—অনু হায় হায় করে।

হরিদাদুর উইল ! উইলের কথা কি বলছ ?

দেড় লক্ষ টাকার বিষয়ের আমাকেই উত্তরাধিকারী করে গেছেন দাদু। তাঁর অ্যাটর্ণি আপিসের কাগজ পত্র নিয়ে এসেছিল লোকটা। সই করে একুশ টাকা দিতে হবে ষ্ট্যাম্প খরচা—অ্যাটর্ণি ফি—না কি। আমি টাকা আনতে ওপরে গেছি আর তুমি এর মধ্যে—

অনুর ক্ষোভ দুঃখ রাগ সব একসঙ্গে মিক্‌শ্চার হয়ে বেরয়—ওঃ ! কী সর্বনেশে লোক তুমি গো !

প্রাণকেষ্ট হতভম্ব হয়ে থাকে।

কিন্তু সেদিনকার প্রাতঃকালের সেই শেষ আগমনী নয়। তারপরে আরো একজন আসে। আরেকবার করাঘাত শোনা যায় দরজায়।

ইস্! বোধ হয় সেই লোকটাই।

অনু ছুটে গিয়ে খিল খোলে।

কিন্তু না। একজন পুলিশের লোক এবার।

আপনাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। আগন্তুক পুলিশ কর্মচারী বলেন—লম্বা কালো ছুঁচোলো গোঁফওলা কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে কি একটু আগে দেখা হয়েছে আজ আপনাদের?

হ্যাঁ, এই মাত্রই তো তিনি চলে গেলেন! আমার ঠাকুরদার অনেক টাকা উনি আমাকে পাইয়ে দিতে এসেছিলেন—বলতে গিয়ে অনু যেন ভেঙ্গে পড়ে।

কেবল আপনাকেই না। এই পাড়ায় আরো আটজন ভদ্র-মহিলাকে তিনি রাজা করে দিতে এসেছিলেন। রাজা কিম্বা রাণী যাই বলুন। ললিতা দেবীকে গোলকুণ্ডার হীরার খনি দিয়ে গেছেন, যমুনা দেবীকে বিপুল জমিদারি,—আপনার টাকাটা কতো?

অনু কিছু বলতে পারে না। ষ্ট্যাম্প খরচা কিম্বা অ্যাটর্ণি ফি বাবদে একুশটা টাকাও নিতে তিনি ভোলেননি আশা করি? দারোগাবাবু শুধান।

আজ্ঞে আমার একটু ভুলের জন্যই টাকাটা ওঁকে ভুলতে হয়েছে। প্রাণকেষ্টই জবাবটা দেয়।

॥২॥

অদ্বিতীয় প্রাণকেষ্টর দ্বিতীয় কাণ্ডটা এইবার।

আত্মীয়দায় বড় দায়। আত্মীয়তার মত দায় আর হয় না। আত্মীয়তা আদায় করা যেমন—তেমনি তা বজায় রাখাও শক্ত।

আত্মীয়র মতন মারাত্মক নেই। অতিথির ন্যায় তিথির বাছ-বিচার নেই তাদের। কালাকালের কাণ্ডজ্ঞান নাস্তি!

আকাল পড়লে দেশ পাড়াগাঁ থেকে রবাহুত অনাহুতের দল শহরে এসে ভিড় করে। আর আত্মীয়রা দেখা দিলেই আকাল পড়ে। এই সব তত্ত্ব আপনমনে খতিয়ে আপনার ক্ষতিবিক্ষতির আলোচনা করছিল প্রাণকেষ্ট আপনমনে।

অনু তখন থেকে ছটফট করছে। সাতটা বেজে গেল—কর্তার দেখা নেই এখনো।

এখনই হয়তো মহিমারা এসে পড়বে। অনুমাত্রও যদি ওঁর হুঁস থাকে। আপিস থেকে একটা দিনও—আজকের দিনটাও—কি একটু চটপট বাড়ি ফিরতে নেই? ওঁর আসার আগে যদি এসে ওরা পড়ে আর গৃহস্বামীকে অভ্যর্থনাকালে অনুপস্থিত দেখা যায় তাহলে কী বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে বলো তো? কোনদিনও কি একটু আক্কেল হবে না ওঁর?

অনিমা ছটফট করে। ছটফট করে ঘুরে বেড়ায়। নিজের কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে এধারের জিনিস নড়িয়ে ওধারে রাখে, ওদিকের জিনিস সরিয়ে এদিকে আনে—তারপর একেক সময়ে সরে এসে দূরে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করে—না, এইবার দেখতে আরো ভালো হোলো। বেশ মানানসই হয়েছে এবার।

নিজেকে যেমন বেশবাসে সাজিয়েছে, নিজের আবাসকেও তেমনি সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের অনুরূপ করতে চায়। যেমন তার মনের রূপ মূর্তি ধরেচে তার এই গৃহস্থালীতে···তার অনুকৃতি—তারই কৃতিত্ব চারিদিকে···কিন্তু তা যেন হোলো···তাই যেন দেখালো—কিন্তু এই অনুগৃহীত জগতের সবচেয়ে বড়ো দ্রষ্টব্য, গৃহস্থ যে, তারই এখনো দেখা নেই।

ধুমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর কক্ষচ্যুত হবার সম্ভাবনা আছে বলে শোনা যায়। কিন্তু সংঘর্ষের আগেই প্রাণকেষ্ট ঘর ছেড়ে পালাবে—এটাই বা কেমন? আর তাছাড়া মহিমারা কিছু ধুমকেতু না, মহিমার বর নিরঞ্জন একটু ধুমধাম ভালবাসে তা ঠিক, এবং দেখতেও একটু ধুমসো বটে—আর, সিগ্রেট খেয়ে খেয়ে ঘরটাকে প্রধুমিত করে রাখে—কিন্তু তাই বলে তাকে ঐ আখ্যা দেয়া যায় না।

নেপথ্যে একটুখানি আওয়াজ হতেই প্রাণকেষ্টর আবির্ভাব টের পাওয়া গেল। ঝঙ্কার দিয়ে উঠল অনিমা! হ্যাঁগা, আজকের দিনেও কি এত দেরি করে? আজো কি একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে নেই? আধঘণ্টা ধরে আমি ছটফট করছি, কখন আসো কখন আসো, কখন তুমি আসো, আর কখন তারা আসে! আর তুমি কিনা এদিকে···

প্রাণকেষ্ট প্রতিবাদচ্ছলেই হয়তো কিছু বলবার জন্যেই হাঁ করেছিল বার দুয়েক, কিন্তু অনিমার তোড়ের মুখে নিতান্তই তা 'না' হয়ে বুজে গেল।

··যাও, অমন করে সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় ছেড়ে তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুনিই তারা এসে পড়তে পারে, জানো তো? অনু নিজের কথার অনুবাদ দেখতে চায়, প্রতিবাদ পছন্দ করে না।

সেকথা পুনঃপুনঃ জানানোর দরকার করে না, অনু—প্রাণকেষ্ট জানায়।

যখনই আমার কোনো আত্মীয় স্বজন আসে, তুমি যেমন কেমনধারা হয়ে যাও। ফোঁস করে ওঠে অনু,(আপনার লোক আসুক, কে না চায়? তারা বাইরের খোলা হাওয়া নিয়ে আসে, সংসারের স্বাদ ফিরিয়ে দেয়। বাঁধ-ধরা জীবনের একঘেয়েমি দূর করে।)

একঘেয়েমি দূর করবার জন্যে অনেকগুলি ঘা খাবার দরকার করে না। হাঁপধরা জীবনে ঝোড়ো হাওয়া টেনে এনে হাঁপানি ধরাবার কোনো মানে হয় না। প্রাণকেষ্ট বলে।

হ্যাঁগা, তুমি যেন কী! দিনকের দিন কি যেন হয়ে যাচ্ছো—একলাষেঁড়ে, একগুঁয়ে কী রকম। কোনো আমোদ—কোনো ফুর্তি নেই প্রাণে যেন অকালপক্ক একটি অথর্ববেদ। মহিমার বর নিরঞ্জনকে ছাখো তো! তোমার চেয়ে বয়সে কতো বড়ো অথচ কেমন ফুর্তিবাজ!

দেখেছি: গতবারে যখন এসেছিল তার ফুর্তির চোট দেখা গেছল। দুখানা চেয়ার দিয়ে সেই যে কী কায়দা দেখিয়েছিল বেশ মনে আছে আমার···

ভাবো দিকি কী আমোদ ··!

কায়দা দেখাতে গিয়ে চেয়ার দুখানা—দামী দামী চেয়ার—সেই সঙ্গে নিজের পা ভেঙ্গে মাসখানেক পড়ে রইলো বিছানায়, মনে আবার নেই! দিনরাত রুগ্ন-শয্যার পাশে তটস্থ থেকে সেবা শুশ্রূষার হাঙ্গাম—সেই ডাক্তার দেখাও—ওষুধ আনো—সেসব কি ভুলবার? তার ওপর ওষুধ, পথ্য, ডাক্তারের ফি—তাও আমাদেরই গুণতে হয়েছে! অথচ চেয়ার নিয়ে ঐ ফুর্তি না করলেই কি চলতো না? এ কী রকমের আত্মীয়তা বাপু?

আত্মীয়তার তুমি কি বোঝো? নিজে কখনো কারু বাড়ি যাবে না, বেরুবে না কোথাও, আত্মীয়দের খোঁজ খবর নেবে না, কেবল নিজের ঘরের কোণ আঁকড়ে পড়ে থাকবে। আত্মীয়তা করা কী জিনিস তুমি তার জানবে কী! মহিমারা এসে বেশ কিছুদিন এখানে কাটাক—কাটিয়ে যাক মাসখানেক, আমি তাই চাই।

তাই চাও নাকি? প্রাণকেষ্ট বলে। তাহলেই হয়েছে! একথাটা আর উচ্চারণ করে না। মড়ক মারী দুর্ভিক্ষ অনেক সময়ে পথ ভুল করে, পঙ্গপালও ভুল করে অপর ক্ষেতে গিয়ে পড়ে, মৃত্যুও শিয়রে এসে অজান্তে ফিরে যায় কখনো কখনো। কিন্তু আত্মীয়ের বেলা অন্যথা হয় না। যে গাড়ীতে আত্মীয়রা আসে তাতে কলিশন হবার কথা শোনা যায় নি কখনো। শ্রুতি এবং স্মৃতি সুলভ প্রাণকেষ্টর এইসব দার্শনিক অভিজ্ঞতাকে সত্য প্রতিপন্ন করে মহিমা আর নিরঞ্জন যথাসময়ে নিরঞ্জন-মহিমায় এসে দেখা দিলো।

দরজার কড়া নড়তেই অনিমা কান খাড়া করেচে। প্রাণকেষ্ট বলেচে—ঐ! ঐরে! ওরা এসেছে! ওরাই! ওরা ছাড়া আর কেউ না।

বলতে বলতে এসে পড়ল ওরা। অনিমার বোন মহিমা, মহিমার বর নিরঞ্জন, আর নিরঞ্জনের দুলালী ইরা। ইরার বয়স বারো।

এই যে প্রাণকেষ্ট! কেমন আছো প্রাণ? মেজাজ শরীফ তো? নিরঞ্জনের ফুর্তি, দেখা গেল, দেখতে না দেখতেই।

নিরঞ্জন যে! ভালো আছো বেশ? প্রাণকেষ্টর শুকনো অভ্যর্থনা। মহিমা, আমাদের যে ভুলে হাওনি, তুমিও যে এসেছো মনে করে—তাতে যে কী খুসী হলাম বলতে পারি না।

আপনাদের কখনো ভোলা যায় জামাইবাবু। কী যে বলেন আপনি! মহিমা বলে, ইরা, তোমার মেসোমশাইকে প্রণাম করো!

থাক থাক। হয়েছে।. ওতেই হবে। প্রণামাঘাতের ভয়ে প্রাণকেষ্ট তিন পা পিছিয়ে যায়। ইরা আমাদের খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

লক্ষ্মী মেয়ে! হ্যাঁ, লক্ষ্মীই বটে! —নিরঞ্জন উসকে ওঠে, আর দু-এক বছর সবুর করো না ভায়া, তারপর দেখো ইরাকে! তখন ওর পদভরে সারা বাংলাদেশ টলমল করবে। বলে, এখনই আমাদের পড়া কাঁপছে। বাড়ি পড়ো-পড়ো।

আশ্চর্য নয়! যেমন বাপ-মার মেয়ে! কিছু না হলেও থোড়া

খোড়া তো হবে! প্রাণকেষ্ট মনে মনে বলে। এবং এখনই তাকে একটু কম্পান্বিত দেখা যায়।

তাই নাকি, ইরাবতী? এতো বড়ো হয়েও এখনো তুমি পাড়াময় ছুটোছুটি করে বেড়াও। অ্যাঁ? যারা দেশময় ছুটোছুটির কথা—ইরাবতীর ক্রীড়া-মতি বাঁধ ভেঙে দেশজোড়া হলে কী দাঁড়াবে—প্রাণকেষ্ট ভাবতে পারে না।

ছুটোছুটি? ছুটোছুটি কি হে? তুমি যে অবাক করলে বন্ধু? ইরা ছুটবে কি! ইরা নাচে। এর মধ্যেই ও যা নাচ শিখেচে দেখলে তাক লাগে। নিরঞ্জন বিশদ করে দেয়।

ইরাও প্রতিবাদ করে, আমি এমন কি বড়ো হয়েছি মেসোমসাই? আমার বয়স তো সবে বারো।

পাইকিরি হাসি পড়ে যায়।

ও, তাই নাকি? প্রাণকেষ্ট নিজের ভুল বুঝতে পারে। এবং বুঝে লজ্জিত হয়—নিরঞ্জন ইরা দুজনের কাছেই। কোনো মহিলার, অবয়বে যতই সে হ্রস্ব হোক, বয়সের প্রতি কটাক্ষ করা শোভন নয়। বয়স ছাড়া আর সব কিছুর শ্রীবৃদ্ধি মেয়েদের কাম্য। কেবল ঐ একটি বিষয়, যেদিক বাড়লেও ওরা বাড়ন্ত থাকতে চায়—চিরদিন। কথাটা প্রাণকেষ্টর মনে পড়ে।

জলযোগের পর সবাই আরাম করে বসেছে, প্রাণকেষ্ট বল্ল, হ্যাঁ, ভালো কথা! নিরঞ্জন এবার তোমরা বেশ—বেশ কিছুদিন থাকচো তো এখানে? প্রাণের কথাটা প্রাণের বহির্গত না করে সে পারে না।

অ্যাঃ, চুপ করো—অনু উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

তা—মেরে কেটে দিন পনেরো থাকা যাবে'খন। ছুটি পেলে আরো কিছুদিন কাটানো যেত কিন্তু···

সত্যি! দিদির এখানে এমন আমোদে দিনগুলি কাটে যে ছেড়ে যেতে মায়া করে। কিন্তু তোমার আবার যা আপিস! মহিমাই স্বামীর বাক্য সম্পূর্ণ করে দেয়।

ওহে, সিগ্রেট আছে? নিজের পকেট হাতড়ানো শেষ করে নিরঞ্জন পকেটের বাইরে অনুসন্ধান করে। —ফুরিয়ে গেছে দেখছি আমার।

সিগ্রেট! সিগ্রেট তো আমি খাই না, জানো তুমি! প্রাণকেষ্ট জানায়; ইস্কুলে খেতাম, তারপর বিয়ের পর থেকে···পারিবারিক অনুশাসনের পালাটা সে আনুপূর্বিক বলতে যায়।

আচ্ছা, কী হচ্ছে? অনু গজরে ওঠে। অনুমূলক সব কিছু তার কাছে অমূলক ছাড়া আর কিছু নয়।

অনুরুদ্ধ হয়ে প্রাণকেষ্ট অন্য কথা পাড়ে; আচ্ছা, আনিয়ে দিচ্ছি সিগ্রেট। বলে সে উঠে পড়ে। আনাচ্ছি বোসো। বলে নিজেকেই আনতে পাঠায়।

হিঃ! আনিয়ে রাখা উচিত ছিল আগেই। নিরঞ্জনবাবু সিগ্রেট ভালবাসেন ভীষণ। অনিমা বলে, আমিও বলতে ভুলে গেছি, আর উনি যে নিজের থেকে খেয়াল করে কিছু করবেন তাহলে তো হয়েই ছিলো!···

নৈশ ভোজন সমাধার পর নতুন সমস্যা দেখা দিলো। অনুর অনুস্বর শোনা গেল ওগো শুনছো?

কী—বলো না?

ছাখো, ইরা না হয় আমার কাছে শোবে। মহী আর নিরঞ্জনকে আমাদের বাড়তি ঘরটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তুমি, তুমি—শোবে কোথায়?

তাই তো! আমি কোথায় শুই! প্রাণকেষ্ট ভাবনায় পড়ল —তা—আমার শোয়া—আমাকে শোয়ানো কি এতই বিশেষ দরকার?

নাও, রসিকতা রাখো। ভাঁড়ার ঘরে যে বেঞ্চিটা আছে তার থেকে হাঁড়িকুঁড়িগুলো নামিয়ে তোমার জন্যে জায়গা করে দোবো? বিছানা পেতে দেবো তাইতে? বেঞ্চিটা চওড়ায় ছোটো, তা হোক,

তোষক-টোষক দোফর্দা করে পাতা যাবে'খন—বিছানা তাতে বেশ পুরু হবে। আরাম করে শুতে পারবে!

সেই বেঞ্চিটা, যার থেকে সেবার আমি পড়ে গেছলাম? নিরঞ্জনরা এলে সেবার শুয়েছিলাম যাতে—সেটাই তো? না, তাতে আর আমি শুচ্ছিনে বাবা!

অবাক করলে! কেন, বেঞ্চিতে কি শোয়া যায় না? শোয় না মানুষ? রেলগাড়ীতে তবে শুয়ে যায় কি করে?

প্রাণ হাতে করে। দিনের পর দিন—রাতের পর রাত—নিজেকে হাতে করে থাকা আমার পোষাবে না। তার চেয়ে আমি মাটিতে শোবো।

বেশ। তাহলে স্নানের ঘরে তোমার জন্যে বিছানা করে দিই? কেমন?

আমি স্নানের ঘরে শোবো মাসিমা। ইরাকে উৎসাহিত দেখা যায়। চান করবার ঘর—আহা—কী সুন্দর। সেখানে শুতে কী আরাম!

না। তুমি কেন স্নানের ঘরে শোবে। তুমি আমার কাছে থাকবে।

আমি স্নানের ঘরে শুতে পারবো না। কলটা খারাপ হয়ে গেছে। টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ে। প্রাণকেষ্টর আপত্তির কারণ জানা যায়—আর মাথায় জল পড়লে আমার আবার ঘুম হয় না।

কেন, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘুমোনো যায় না কি? তাজ্জব করলে তুমি!

কোনো পতির পক্ষে ছত্রপতি হবার কুণ্ঠা, এমন আশ্চর্য কাণ্ড—এমন কি অসুরও অনুমানের বাইরে।

তার চেয়ে আমি বাইরের ঘরে-শোবো। আমার আরাম-চেয়ারটায়।

নিরঞ্জন তো ওখানে বসে আয়েস করবে। অনেক রাত অব্দি গল্পের বই পড়ে সে, জানো না?

তাহলে আমার শোবার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না তোমার। আমি ঘরের বাইরে গিয়ে শোবো। আরো বাইরে সামনের ফুটপাথেই। সেও আমার ভালো।

প্রাণকেষ্ট জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে, ফুটপাথের সন্ধানেই কিনা বলা যায় না, সবেগে বেরিয়ে যায়। অনিমা ইরার দিকে ফেরে: তোমার মেসোমশাই ঐরকম। আপনার লোকেরা বাড়ি এলে অ্যাতো খুশি হন যে বলা যায় না। যাতে তাদের আরাম হয়, সবাই সুখে থাকে উনি তাই চান। নিজের জন্যে ভাবেনা মোটেই। দেখলে তো?

কিছুক্ষণ ফুটপাথে ফুটপাতে শুয়ে শুয়ে নয়, ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণকেষ্ট কয়লার ঘরে এসে আশ্রয় নিলো—ছুঁচো এবং ইঁদুরদের আপত্তি অগ্রাহ্য না করেই। তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণের দিকে দিকপাত না করে এককোণের কয়লা সরিয়ে কোচার খুঁটে একটুখানি ঝেড়ে নিয়ে সে লম্বা হয়ে পড়লো। ছুঁচোদের সুখ-সুবিধা কেন সে দেখতে যাবে? ছুঁচোরা তো তার আত্মীয় নয়। ছুঁচের মতন তাকে বেঁধে না তারা।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবে। মানুষের সবচেয়ে কঠিন পীড়া হচ্ছে আত্মীয়-পীড়া। নানারকম মারাত্মক জীবাণু আত্মীয়ের ছদ্মবেশে এসে বাসা বাঁধে। সহজে সরে না, সারে না। মেরে তারপরে সরে। একেবারে সারে। এ ব্যারামের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে—ব্যায় আছে, আরাম নেই, এবং উপসর্গ অনেক—কোনটা কখন দেখা দেবে বলা কঠিন।

আত্মীয়ঘটিত এই পীড়ার সবচেয়ে দুর্লক্ষণ দেখা দেয় আত্মীয়ের পীড়া হলে। সেটা পীড়ার ওপরে পীড়া। গোদের ওপর বিষফোড়া হবার মত প্রপীড়ন। খুব সম্ভব, সর্বস্বান্ত হওয়া কিংবা ভিটে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই সেই দুশ্চিকিৎস্য উৎপীড়ন একমাত্র প্রতিকার।

আত্মীয়দের মেরে ধরে তাড়ানো রীতি নয়। তাতে আত্মীয়তা অটুট থাকে না! অথচ এধারে আত্মরক্ষা ও আত্মীয়তা রক্ষা একাধারে অসম্ভব। প্রাণকেষ্ট কী করবে? পাগল হয়ে যাবে কিনা এই কথাই সে শুয়ে শুয়ে ভাবে।···কিন্তু পাগল হওয়াটাই কি সোজা? ইচ্ছে করলেই কি পাগল হওয়া যায়? পাগল হওয়া একরকমের দৈব-ওষুধ—দৈবাৎ এক-আধজন পাগল হতে পারে। প্রাণকেষ্টর সে বরাত নয়। অতো সুখ নেই ওর অদৃষ্টে। দেবতার আশীর্বাদে সে বঞ্চিত।···নিজের হাত কামড়ায়। মাথার চুল ছেঁড়ে। কি করলে পাগল হওয়া যায় প্রাণপণে তার পায়তারা ভাঁজে। · পাগল হতেই বুঝি ওর বাকি আছে কেবল!

ভাবতে ভাবতে ও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন ছাখে। স্বপ্ন ছাখে কি সত্যি ছাখে কে জানে, আকারে প্রকারে হুবহু ওর মতোই আরেক প্রাণকেষ্ট—সেই কয়লার ঘরে তার সামনে এসে দেখা দেয়।

বাবা প্রাণকেষ্ট! ডাক ছাড়ে লোকটা।

প্রাণকেষ্ট চমকে ওঠে—অ্যাঁ। কে তুমি · কা বলছো?

তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম বুঝি? লোকটা একটু অপ্রস্তুত হয়।

বিশ্রাম! না, এমন কিছু বিশ্রাম নয়। অবিশ্রাম বলতে পারো বরং নিজের চোখেই তো দেখছো অবিশ্রাম চলছে! প্রাণকেষ্টর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

দেখলাম বলেই তো ছুটে এলাম। না এসে পারলাম না। তুমি যে-সমস্যায় পীড়িত হচ্ছো তার ওষুধ আমার জানা আছে—সেই কথাই তোমাকে জানাতে এলাম। আমাকে চিনতে পারছো কি বাবা—?

প্রাণকেষ্টর চেনা চেনা ঠ্যাকে। মনে হয় যেন সে ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে চোগা চাপকানের মধ্যে সেধিয়েছে। আর, যে কারণেই হোক বহুৎদিন দাড়ি কামায়নি। দাড়িটা কামালে হুবহু সে নিজেই!

কিন্তু 'আত্মানং বিধি' এই কথা যে উপনিষৎকার বলেছিলেন তিনি নিজেই কি আত্মাকে বিদ্ধ করতে পেরেছিলেন? প্রাণকেষ্টরও তেমনি নিজের শ্রীবৃদ্ধি স্বচক্ষে দেখেও নিজের মন্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়।

না তো! ম্লানমুখে সে জানায়।

কি করে চিনবে। তোমাব জন্মাবার ঢেব আগেই আমি পটল তুলেছিলাম। আমি তোমার কয়েকপুরুষ আগেকাব—তোমারই পূর্বপুরুষ! আমার নাম ধিনিকেষ্ট। শ্রীধিনিকেষ্ট পতিতুণ্ডি। আমি কোম্পানীব আমলের লোক।

ও—তাই! তাই বলো! তোমার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি তো চিনবো কি করে? কি সে কথা থাক, আমাব এই আত্মীয়-সঙ্কটের কি একটা ওষুধ তোমাব জানা আছে—বলছিলে না?

হ্যাঁ, সেই কথাই বলছিলাম। আমার আত্মীয়বা তোমাব মতো নয়—তাবা আবো নিকট আত্মীয় ছিল। পব নয়, অথচ পবের চেয়েও খাবাপ, আবো খবতর; তাদের খপ্পব থেকে কি কবে উদ্ধাব পেলাম সেই কথাই বলতে এসেছি।

তোমাদেব সময়েও আত্মীয়তা ছিল নাকি? তাবাও হানা দিতো—অ্যাঁ! এমনি? আমি তো জানতাম এসব ব্যাধি আধুনিক সভ্যতার আমদানি। সেই আদ্যিকালেও আত্মীয়তা ছিল—বটে? প্রাণকেষ্টকে অবাক হতে হয়।

ছিল বলে' ছিল! আমার বাবা তিনশ তেয়াত্তরটা বিয়ে করেছিলেন। বড়ো জ্যাঠামশাই চারশো নিরানব্বইটা বিয়ে সেবেই দেহরক্ষা কবেছিলেন—পাঁচশো পুরো করে যেতে পাবলেন না—এই দুঃখ নিয়ে নব্বই বছর বয়সে সজ্ঞানে তিনি গঙ্গালাভ করেন। তারপব আমার মেজ সেজ-ন বাঙা-ছোট এই সব জ্যাঠা আর খুড়োরা মিলে সবশুদ্ধু কতো যে বিয়ে করেছিলেন তার লেখা জোখা নেই। আমার মার পেটের ভাই ছিলো মোট সাতজন কিন্তু পৈতৃক ভাইয়ের সংখ্যা এগারোশ চুরাশী—এবং এরা শুধু আত্মীয় নয়, আপনার ভাই,

পরমাত্মীয়। তার সঙ্গে জেটতুত খুড়তত ভাইদের যোগ করে ক' হাজার দাঁড়িয়েছিল তা ধারণা করা যায় না। এই সব আত্মীয়—এবং এদের আত্মীয়—এবং তাদের আত্মীয়দের আত্মীয়তা—এত ধাক্কা আমাকে সামলাতে হয়েছে। ঠ্যালা বোঝ!

প্রাণকেষ্ট সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে চায়। কিন্তু ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারে না। শুধু বলে—ওরে বাবা!

না, আমাকে পিতৃসম্বোধন কোরো না। আমি তোমার বাবা নই— আমি তোমার বাবার—বাবার—বাবার—বাবার—বাবার—বাবা।

প্রাণকেষ্ট আবার 'ওর বাবা' বলতে যাচ্ছিলো, সামলে নিয়ে বলে—তা, এত আত্মীয় নিয়ে তুমি খুব বিপদে পড়েছিলে বোধ হয়?

বিপদ? বিপদ বলে বিপদ? কোম্পানির চাকরি নিয়েছিলাম বলে আমার একটু রোজগার পত্র ছিল। তাই সবাই মিলে আমার স্কন্ধে এসে ভর করলো। নিকটাত্মীয়, দূর আত্মীয়, অদূর আত্মীয়—কোনো দুরাত্মাই বাদ দিলো না। তবে ভগবানের খুব দয়া ছিলো আমার ওপর— এক বছরের মড়কে আমার অনেকগুলি আত্মীয় খসে গেল—আরেকবার পদ্মার ভাঙ্গনে তলিয়ে গেল আরো কতক—আর আমার সেজশালীকে টেনে নিয়ে গেল বাঘে—

আহা, মহিমাকেও একটা বাঘে টেনে নিয়ে যেতো যদি! প্রাণকেষ্ট গুমরে ওঠে—কিন্তু বাঘ কি আর আছে আজকাল? থাকলেও বাগে পাওয়া যায় না, যথাস্থানে সময়মত নেই ভেবে ওর দুঃখ হয়।

বাকী যারা রইলো তারা নাছোড়বান্দা। একেবারে যমের অরুচি। বাঘ ভাল্লুক কুমীর-টুমীর কেউ তাদের ছোয় না। কি করি? তাই করলাম কি, কোম্পানীর চা-বাগান খুলেছিল সেই চা-বাগানে তাদের চালান করে দিলাম। ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে জোড়া পিছু কুড়ি টাকা হিসেবে বেচে দিয়ে এলাম। একটু কষাক ষ করলে

আরো কিছু দর উঠত আমি জানি, কিন্তু আমার বেশি তর সইলো না, কে অতো সবুর করে? এমনি জ্বালিয়েছিল ওরা আমাকে যে, অমন সর্ব আত্মীয়ের দর বাড়াবার একটুও আমার মেজাজ ছিল না—ভাবলাম আর অত আদরে কাজ নাই। কিসের অত গরজ? নগদ যা মেলে তাই লাভ! আর বলতে কি, আত্মীয়দের থেকে এরকম উপায়, এত লাভ আমার জীবনে আর হয় নি; পতিতুণ্ডি বংশে তো নয়। ভেবে ছাখো একশো কুড়ি হিঃ ডজন—দুশো টাকা করে কুড়ি—এই দরে কতো ডজন কতো কুড়ি যে বেচেছি তার আর ইয়ত্তা নেই।

সেই স্মৃতির সৌরভে এতদিন পরেও ধিনিকেষ্ট পতিতুণ্ডিকে মশগুল দেখা যায়।

খোসখবরের খোসবাইটা বুঝি প্রাণকেষ্টরো নাকে লাগে। তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

আহা, আমিও যদি তাই পারতুম সে বলে। তাহলে নিরঞ্জন—জোড়টিকে বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম। কিন্তু চিনবে কে? সে চা-বাগান কি আছে আর? বাগান আছে, কিন্তু অমন করে বাগানো নেই। এখন আর কেনা-বেচা করতে হয় না—এখন এমনি লোকে সেধে গিয়ে চা-বাগানের চাকরি নেয়। সভ্যতা-বিস্তারের সাথে সাথে মানুষের অসভ্যতা যেমন বেড়েছে, অসুবিধাও তেমনি বিস্তর।

তাহলে আমার ওষুধ তোমার কোনো কাজে লাগবে না মনে হচ্ছে। ধিনিকেষ্টকেও ম্রিয়মাণ দেখা যায়।

এমন সময়ে খড়ম খট্ খট্ করে লাল চেলি পরণে প্রাণকেষ্টর আরেক প্রতিমূর্তি সেখানে আবির্ভূত হলেন। তাঁর এক হাতে মড়ার খুলি, তাতে তরলমত কি পানীয়।

তাঁকে দেখে ধিনিকেষ্ট সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পায়ের ধুলো নিলো।—ঠাকুর্দা যে! কি মনে করে এখানে?

বেচারা ভারী কষ্ট পাচ্ছে। সেই জন্যেই আসতে হোলো। প্রাণকেষ্টকে দেখিয়ে তিনি বল্লেন।

প্রাণকেষ্টর দুই চোখে—'??' এক জিজ্ঞাসা।

ইনি আমাদের আরো পূর্বপুরুষ, বুঝলে প্রাণকেষ্ট? আমার ঠাকুর্দা, কুলাচার্য শ্রীমৎ কালীকেষ্ট পতিতুণ্ডি।

নিজের সময়ে একজন নামজাদা তান্ত্রিক ছিলেন। কালী সাধনা করতে করতে শেষে ইনি কাপালিক হয়ে যান।

বৎস প্রাণকেষ্ট! তুমি আত্মীয়দের নিয়ে বড় বিব্রত বোধ করছ—তাই না? আর কিছু না এক কাজ করো। খেয়ে ফ্যালো। কাপালিক কালীকেষ্ট এই উপদেশ দিলেন।

খেয়ে ফেলবো? -আজ্ঞে কী খেতে বলছেন? প্রাণকেষ্ট ঠিক ঠাওরাতে পারে না।

কেন, ঐ আত্মীয়দের এক একটাকে ধরো, আর খাও। ধরে ধরে খাও। এ ছাড়া উপায় নেই।

আত্মীয়দের খাবো, আপনি বলেন? তা কি করে খাওয়া যায়? তারা নিতান্ত অখাদ্য যে। প্রাণকেষ্ট বিশেষ উৎসাহ পায় না।

মোটেই না। তোমার ভুল ধারণা। একমাত্র ঐ ভাবেই ওরা সুস্বাদু হতে পারে। রসনার পথেই ওদের বসালো করা সম্ভব—নতুবা ওরা অতীব বেরসিক। আমি কাপালিক হলাম কেন? কেবল ঐ লোভেই। প্রথমে আমিও তোমার মতই মুখ বেঁকিয়েছিলাম অমনি। যার কাছে আমাদের কুলগুরু নরবলি দিয়েছিলেন তার প্রসাদ মুখে নিতে আমারো বেধেছিলো গোড়ায়। কিন্তু গুরুর আদেশে খেতে হোলো। খেয়ে দেখলাম তোফা, পাঁঠা কোথায় লাগে। তারপর, আমার বিস্তর আত্মীয়কে—যারা আমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল আর তার বদলে আমার গৃহে স্থান নিয়েছিল—তাদের গর্ভে ধারণ করতে দ্বিধা করিনি। আমাদের সময়ে অবিশ্যি একটু সুপ্রথা ছিল। নরবলির প্রথা এখন আর নেই বোধ হয়, যদি থাকে তুমি এক কাজ করো। আগে ওদের কালীঘাটে নিয়ে যেয়ো

মার কাছে বলি দিয়ে তারপরে খেয়ো। তাহলে আর কোনো দোষ হবে না। তাতে তুমিও উদ্ধার পাবে, ওরাও উদ্ধার হয়ে যাবে। ওরই নাম মহাপ্রসাদ।

ভক্তি মুক্তি একাধারে ঘটলেও প্রথম প্রাণান্তকর প্রস্তাবে প্রাণকেষ্ট উৎসাহ পায় না।

না, ও আমি পারবো না। সে বলে: ও কাজ করলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে যাদের খাওয়াতে ফতুর হতে হয় তাদের খেলে আরো কী দুর্গতি হতে পারে তা ধারণা করাই যায় না। মনে হয় সেটা হয়তো ফাঁসির খাওয়া হবে।

তোমার কোনো ভয় নেই, মা আছেন। এই নাও, একটু কারণ বারি পান করে নাও, মন চাঙ্গা হবে। জোর পাবে মনে। মড়ার খুলিটা কালীকেষ্ট বংশধরের দিকে এগিয়ে দেন।

ছি, ঠাকুর্দা। এমন জ্ঞানী, প্রবীণ, বিবেচক হয়ে তুমিও কিনা শেষটায় ছেলে বখাচ্ছো। ছিঃ। ধিনিকেষ্ট আপত্তি করে- তার নীতিজ্ঞানে আঘাত লাগে।

কোনো দ্বিধা কোরো না, প্রাণকেষ্ট। পান করো। তোমার ওপরে আমি অনেক ভরসা করেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আমার মান রাখবে। বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে আবার। আমাদের বংশে আরেকজন কাপালিক জন্মাবে এই আমার আকাঙ্খা ছিল। আমার সেই সাধ কে মেটাবে তার পথ চেয়ে পরলোকেও আমার শান্তি নেই। কপালক্রমে সেই আশা যদি তোমার দ্বারা পূর্ণ হয়—তুমি যদি কাপালিক হও, তাহলে আমাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হবে, বংশ ধন্য হবে, সবাই আমরা কৃতার্থ হবো।

উপরোধে পড়ে প্রাণকেষ্ট একটুখানি কারণের স্বাদ নেয়, কিন্তু কার্যের বিষয়ে তার তেমন উদ্দীপনা দেখা যায় না। কার্য-কারণের যোগাযোগ না দেখে কুলাচার্য একটু ক্ষুণ্ণ হন।

প্রাণকেষ্ট তাঁকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে: আজ্ঞে, একেবারে

না খেলে কি হয় না? রামকেষ্টদেব—তিনি আমাদের পাতভুণ্ড বংশের কিনা জানি না—বলতেন যে, ফোঁস করো, তাতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কখনো ছোবল মেরো না। তা, আত্মীয়দের বেলায়ও, না সব খাবলে কেবল ফোঁস করলে হয় না?

শুনে কালীকেষ্ট ফোঁস করেন। রামকেষ্টদেব? তিনি দেবতা হতে পারেন। কিন্তু আমাদের আত্মীয়দের তিনি কী জানেন? বোঝেন কী? এ বিষয়ে কদ্দুর তাঁর অভিজ্ঞতা—শুনি?

তা বটে! এসব দৈত্য নহে তেমন। প্রাণকেষ্টকে সায় দিতে হয়।

তাছাড়া যদ্দুর মনে হচ্ছে, তিনি পতিতুণ্ডি ছিলেন না। কে ছিলেন রামকেষ্টদেব? আমরা কখনো তাঁর নাম শুনিনি—তা, তিনি যেই হোন, যতো বড়ো দেবতাই হোন, পতিতুণ্ডিদের সমস্যা বোঝা তাঁর কর্ম নয়। বরং আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বটকেষ্ট পতিতুণ্ডির কথা বলতে পারো! তিনি বলতেন, যদি ফোঁস করে ছেড়ে দাও তো পরে আফসোস করবে। ফোঁস নয় ফাসাও গিয়ে আগেই—নইলে দেখবে সেই এসে কখন তোমাকে গুম করে দিয়েছে। আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ না দিয়েই। তাই ফাসি যেতে হয় সেও স্বীকার, কিন্তু আগে ফাঁসিয়ে যাওয়া চাই

প্রাণকেষ্টর টনক নড়ল: কে আসছেন না? চেনা চেনা আওয়াজ পাচ্ছি। আমার কোনো আত্মীয়ই বোধ হয়?

আত্মীয়ই বটে নামাবলী গায়ে, কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি। প্রাণকেষ্টর অনুরূপ আরেক চেহারা দর্শন দান করেন।

আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ—প্রভুপাদ শ্রীল হরেকেষ্ট পতিতুণ্ডি। তোমাদের ইনি কে হন—তোমরা নিজেরাই আন্দাজ করে নাও। কুলাচার্য নত হয়ে প্রভুপাদের পদধূলি নেন।

প্রাণকেষ্টর আন্দাজ অতদূরে পৌঁছয় না—একটু চেষ্টা করেই সে হাল ছেড়ে দেয়।

প্রভুপাদ, এমন বেশে এখানে হঠাৎ? জিজ্ঞেস করেন কুলাচার্য।

আর বলো কেন? বংশলোপের আশঙ্কায় আসতে হোলো। বেচারা প্রাণকেষ্ট পাছে বাড়ী ছেড়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যায় সেই ভয়ে—

প্রভু! একটুখানি আমাদের কুঁড়ে, আমাদের দুজনেরই তাতে কুলোয় না। তার ওপরে—প্রাণকেষ্ট কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে।

ঠিক কথা। আমার জীবনেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছিলো। আমার কুঁড়েতেও রাজ্যের কুঁড়ে লোকের আমদানি দেখেছিলাম। তবে আমি কিন্তু তাদের তাড়ালাম না। আসতেও বারণ করলাম না—তাদেরই ঘাড় ভেঙ্গে আমার প্রাসাদ বানালাম। কালক্রমে সেই প্রাসাদ ফলাও হয়ে বেড়ে উঠে মহাপ্রসাদ হয়ে দাঁড়ালো।

হ্যাঁ, উনি বলছিলেন বটে—মহাপ্রসাদের কথা। প্রাণকেষ্ট জানায়: কিন্তু আমার ওতে তেমন রুচি হচ্ছে না।

মহাপ্রসাদ নয় মূর্খ, মহাপ্রাসাদ। রাজারাজড়াদের যা থাকে, তাই। নবাবদের রঙমহল, শীষমহল খাসমহল সব জড়ালে যা একখানা হয় তার কথাই আমি বলছি।

আ-কার ভেদে প্রসাদ এবং প্রাসাদের পার্থক্য করার প্রয়াস পায় প্রাণকেষ্ট: প্রভু কি করে তা হোলো? আমায় সবিশেষ বলুন!

শুধু মন্ত্রের জোরে! মন্ত্রবলে, আবার কি? প্রভুপাদ প্রকাশ করলেন: তারাও আসতে লাগলো, আমিও তাদের মন্ত্র দিয়ে গুরু-দক্ষিণা নিয়ে ছাড়তে লাগলাম। গলায় কণ্ঠী আর কীর্তন দিয়ে, কণ্ঠে আর পিঠে নামাবলী দিয়ে ছেড়ে দিলাম। তাদের ইহলোকের যথা-সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পরলোকের পথ মুক্ত করে দিলাম। যেমন হাসতে হাসতে তারা এসেছিল—অদৃশ্য কাঁঠাল হাতে করে আমার মাথায় ভাঙবার জন্যে—তেমনি কাঁদতে কাঁদতে একদিন চলে গেল। কিন্তু তা কান্না নয়—তারই নাম গান। জীবের গতি, জীবনের একমাত্র সম্বল—তার নামই কৃষ্ণকীর্তন।

মনে আমার হয়নি। প্রাণকেষ্ট বিস্মিত হয়।

শুনেছো কিন্তু শোনার মত করে শোনোনি। তাহলে মন্ত্রের ফল দেখতে। তোমরা একালের ছেলেরা মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করো না, নইলে কলিতে নাম ছাড়া আর কী আছে? হরের্নাম, হরের্নাম, কলৌ নাস্তৈব কেবলম। প্রভো, তুমিই সত্য! প্রভুপাদ যুক্ত করে তাঁর প্রভুকার প্রতি যেন নমস্কার নিক্ষেপ করলেন।

তা জানি এ যুগে নামের জন্যই সব। হরণ পূরণ যা কিছু করা —নাম বাজাতেই। তা ঠিক। প্রাণকেষ্ট ঘাড় নাড়ে, অনেকটা নমস্কারের মত করেই।

আহা কী নাম! আর মন্ত্রের মত অব্যর্থ। যেমন জোরালো তেমনি ধারালো। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ! অর্থাৎ তিনিই সব হরণ করেন—আমরা শুধু নিমিত্তমাত্র—তাঁর সহায় কেবল। তিনিই তো বলে গেছেন গীতায়, নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচী। নিমিত্ত হও, নিমিত্ত হলেই সব্যসাচী হতে পারবে।

সব্যসাচীর নিমিত্ত হওয়াটা হতে পারার যেন চূড়ান্ত। প্রাণকেষ্ট সেই ড়ার ওপরে গিয়ে খাড়া হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকাতেই তার মাথা ঘোরে।...

কেবল নাম দিয়ে আপনি কাম ফতে করলেন মন্ত্রের কেরামতিতে ঐ কুড়েদের দিয়ে, কুড়ে ঘরের থেকে আপনার মহাপ্রাসাদ হোলো? এ যে দেখছি—আলাদিনের কাণ্ড!...একি আমি পারবো?—গুরুগিরি কি আমার দ্বারা হবার? আমার কি অতোখানি গুরুত্ব আছে?

খুব পারবে বৎস, খুব পারবে। আত্মীয়দের ধনে প্রাণে মারতে পারবে না—কী যে বলো! তুমিও যে তাদের আত্মীয়, সে কথা কেন ভুলে যাচ্ছো? আর আত্মীয়ের পক্ষে এর চেয়ে সহজ কার আর কী আছে? প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করো—বৎস প্রাণকেষ্ট! আমাদের

আসল খোদ কেষ্টর কথাটাই ভাবো না একবার !

খোদ কেষ্ট ? তিনিও কি আমাদের—আমাদের পতিতুণ্ডি ছিলেন ? প্রাণকেষ্ট হতবাক হয়।

'পতিতুণ্ডি না হোন, পতিতপাবান তো বটে। সমগোত্র বইকি ! আত্মীয় কবলে যারা পতিত তাদের উদ্ধারকর্তাও তিনি। তিনি নিজে কী করেছিলেন মনে নেই ? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধিয়েছিল কে ? তিনিই তো ! অতো আত্মীয়নিপাত আর কোন যুদ্ধে হয়েছে ? তাতেও শান্তি না পেয়ে শেষে নিজের যদুবংশ অব্দি ধ্বংস করে তবে তিনি ক্ষান্ত হন। এতেই বোঝো।

প্রাণকেষ্ট বোঝে। কিন্তু বুঝেও বোঝে না -আমি কি পারবো অমন একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাতে পারবো কি আমি ? তার সংশয় জাগে।

খুব পারবে। সংশয় কোরো না। সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। প্রত্যহ গীতা পাঠ করো। নাকের ওপর তিলক চড়াও। সেই সঙ্গে পাইকিরি দরে নামাবলী আর কণ্ঠীর বায়না দিয়ে রাখো। আত্মীয়দের ডাকো। সহজে না আসে, নিমন্ত্রণ করে খাবার লোভ দেখিয়ে আনাও। আর তারপরে নামাবলীর ফাঁস জড়িয়ে—নামজাদা গামছা তাদের গলায় দিয়ে—বুঝতেই পারছো ! শেষটায় আমি আর আত্মীয়-অনাত্মীয় বাছিনী। যে এসেছে, কাছে ঘেঁষেছে, যাকে পাকড়াতে পেরেছি তাকেই দীক্ষা দিয়েছি ! হাড়ে হাড়ে দীক্ষা ! আর, তা না দিয়ে তো নিস্তার নেই—জীবে দয়া নামে রুচি আমাদের ধর্মই যে !

আমার বেলায় কিন্তু জীবে রুচি আর নামে দয়া—দয়াটা আমার নামমাত্র। কিন্তু রুচিটা আপনার চেয়ে বেশী। কুলাচার্য নিজের কথা বলেন। নিজের কেলি-কাহিনী।

তুমি আমাদের বংশের কুলাঙ্গার। তিন কুল খেয়ে শেষ করেছো। তাঁদের বাঁচিয়ে রোজগারের উপায় করলে কতো লাভ

হতো একবার তলিয়ে দেখেছিলে ? প্রভো, তুমিই সত্য ! প্রভুপাদ নিজের টিকিতে হাত বুলান।

আর তুমি বুঝি আমাদের বংশের এক মহাপুরুষ ? তাই বুঝি ? কুলাচার্যের কুলোপনা চক্র দেখা দেয়। এক ঢোঁক কারণবারি গিলে নিতেই তাঁর চোখ জবাফুলের মত টকটকে হয়ে চর্কির মতো ঘুরতে থাকে : বটে ? পুরুষ তো অনেক দেখলাম—চোখেও দেখেছি, চেখেও দেখেছি, মহাপুরুষকে তো দেখি একবার ! যার দয়ায় সাধারণ পুরুষই মহাপ্রসাদ হয়ে ওঠে, কিন্তু আস্ত একটা মহাপুরুষ কিরূপ দাঁড়ায় সেটাও তো একবার দেখতে হয় !

এই বলে কুলাচার্য প্রভুপাদকে তাড়া করতেই তিনি—ওরে বাবারে ! খেয়ে ফেল্লেরে ! বলে প্রাণান্ত এক ডাক ছেড়ে কয়লা-ঘরের জানলা দিয়ে উধাও হলেন। কুলাচার্যও পেছনে পেছনে দৌড়ল - খড়ম হাতে 'চার্জ' করে।

বেশ একটা ঘরোয়া বৈঠক জমেছিল—এমন ভাবে ভেস্তে গেল ! প্রাণকেষ্ট নিজের মনোকষ্ট জানায়।

ধরতে পারলে খেয়ে ফেলবে ঠিক। আমিও চল্লাম। দূরে দাঁড়িয়ে দেখি গে—কদ্দূর গড়ায়। মহা-মহাপ্রসাদ পর্যন্ত গড়ায় কিনা দেখা যাক। ফাঁক পেলে আর প্রসাদ পেলে একটুখানি ঝোল চাখবো না হয়। এই বলে ধিনিকেষ্টও উধাও হয়।

হ্যাগা, উঠলে ? কয়লাঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাক ছাড়ে অনু।

রক্ত চাই—রক্ত চাই ভেতর থেকে জড়ানো গলায় জবাব আসে।

এত বেলায়ও ওঠোনি, তোমার কি হয়েছে ?···অনু ভেতরে গিয়ে অনুসন্ধান করে। —ইস্ ! কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে। গরম যেন দেখছি গা-টা।

আমি খাবো। ধরবো আর খাবো—একেকটাকে ধরে কেটে-

কুটে মশলা দিয়ে বেশ গরগরে করে রাঁধবো—চপ্—কাটলেট—কর্মা কোপ্তা—কালিয়া—কাবাব। তারপরে সেই কালিয়দমন করা আমার কাজ। আমাদের চোদ্দ পুরুষের কম্মো। আমাদের বংশের আদি পুরুষ কে ছিল জানো? খোদ কেষ্ট—যে কুরুক্ষেত্র আর কালিয়দমন করেছিল। আমিও করবো। প্রাণকেষ্টর চোখ ঘুরছে। খালি শুধু কপালই পুড়ছে না।

খাবে বই কি! ওঠো, চা হয়েছে। মুখহাত ধুয়ে খাবে এসো।

হতভাগাটা বকছে কী? ব্রাশ হাতে নিরঞ্জন যাচ্ছিলো, দাঁড়িয়ে প'ড়ে কান পেতে শোনে। রাত্রে ইঁদুর কামড়েছে বোধ হয়··· র‍্যাট-পয়জন হয়েছে মনে হচ্ছে।

কেন, আমি কি কুরুক্ষেত্র করতে পারিনে? নিরঞ্জনকে দেখেই প্রাণকেষ্ট লাফ মেরে ওঠে। উঠে আরেক লাফ ছাড়ে। ম্যায় ভুখা হুঁ! হাঁক ছেড়ে তাড়া করে যায়।

আরে মলো যা! নিরঞ্জন তিন হাত পিছিয়ে পড়ে। —ভুখা হুঁ তো আমি কি করবো? তোমার গিন্নিকে বলো, সে খাবার এনে দেবে।

খাবার নয়। তুমি। তোমাকে খাবো। হাড় খাবো, মাস খাবো, চামড়া নিয়ে ডুগডুগি-বাজাবো। আমিও কি তোমার আত্মীয় নই? আত্মীয়তা করতে জানিনে আমি? পাকড়াই আগে, তারপর চপ কাটলেট বানিয়ে খাবো তোমায়।

সাধের কথা শুনে মরে যাই। নিরঞ্জন বলে। মুখে সে বিরক্তি দেখায় বটে, কিন্তু মনে মনে ভয় খায়। দাঁত-মাজা ব্রাশ দিয়ে কতোদূর আত্মরক্ষা করা যাবে ভেবে ছাখে। এধারে ওধারে তাকিয়ে লাঠি শড়কি কিছু তার চোখে পড়ে না।

ভালো আপদ হোলো!···ওর কি আজকাল মাঝে মাঝে এমনি ধারা ফিট হয় নাকি?

কই, এমন হতে কখনো তো দেখিনি। অন্য কাতর হয়ে পড়ে! বাড়ীতে হতে দেখিনি তো কখনো।

হাঁক ডাক শুনে ইরার মাও এসে ... .খুব মন্দ লাগছে না, আমোদ পাচ্ছে বেশ, কিন্তু ওর মা ভাবিত হয়ে পড়েছে—জামাইবাবুর কী হোলো দিদি? চাপা গলায় সে শুধিয়েছে।

কী যে হয়েছে তা জানবার জন্যে প্রাণকেষ্ট নিজেই প্রস্তুত। সেই ধেই ধেই করে নাচতে আরম্ভ করে দ্যায় আর রক্ত চাই রক্ত চাই বলে চেঁচাতে থাকে। চেঁচানি আর নাচানিতে তার একাকার। আবার সে ছড়া কাটে:

"বলবে বন্য হিংস্র বীর।
দুঃশাসনের চাই রুধির॥
চাই রুধির রক্ত চাই।
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই!
দুঃশাসনের রক্ত চাই!
দুঃশাসনের রক্ত চাই!!..."

বাঃ মেশোমশাই, তুমি তো নাচতেও পারো। বেশ চমৎকার নাচ তো! ইরা বাহবা না দিয়ে পারে না: আমাদের যে নাচ শেখায় তার চেয়েও তুমি ওস্তাদ।

তোকে আমি খাবো। কড়মড় করে খাবো। চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো। চেটে-পুঁটে খাবো।....তোকে কাটলেট করলে কেমন হয়? লোলুপ নেত্রে ইরার দিকে সে তাকায়।

বেশ হয়। কিন্তু আমাকেও একটু চাখতে দেবে-তো? ইরার অনুরোধ থাকে।

তা দেখা যাবে। আগে তো তোকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দিই! সে তখন পরের কথা।

ওমা, কী অলুক্ষণে কথা গো। মুখপোড়া মিনসে বলে কি! ষাট্ ষাট্। বালাই ষাট্। মহিমা ইরাকে হস্তগত করে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রাণকেষ্ট গুণে গুণে দ্যাখে—এক দুই তিন। মোটমাট পৌনে

এক গণ্ডা। চা-বাগানে নেয় না আজকাল—তবে কসাইখানায় নিতে পারে। দশ টাকা দরে বেচলেও পৌনে এক গণ্ডার দাম তিরিশ টাকা—নেহাৎ মন্দ কী? তবে পুরো এক গণ্ডা হলেই ভালো হোতো। কিন্তু পাচ্ছি কোথায়?

ইরা বলে: মাসিমাকেও যদি ধরো, তাহলেই তোমার গণ্ডা পোরে। কে পরামর্শ দেয়। প্রাণকেষ্ট অন্নর দিকে তাকায়: হ্যাঁ, তাহলে পাওনা গণ্ডা পুরো হয়, কিন্তু ওটা একটা গণ্ডার। গণ্ডার কসাইরা ছোঁবে না। মানুষে খায় না তো।

অন্নু এতক্ষণ অতি কষ্টে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল, এবার আর পারে না। প্রাণকেষ্ট তার রক্তমাংসের উচিৎ দাম দেয় না বলেই তার আত্মমর্যাদা আহত হয় কিনা কে জানে, চোখে আঁচল চেপে সে ফোঁপাতে থাকে। অকস্মাৎ তার এ কী সর্বনাশ হোলো, ডাক ছেড়ে কাঁদলেও যার দুঃখ যায় না। সেই অনুচ্চারিত দুঃখে সে গুমরে গুমরে ওঠে।

হঠাৎ এসব কেনা বেচার কথা কেন মেসোমশাই? আবার কথাটা চাপা দিচ্ছেন যে? সেটা কি বাদ পড়ে গেল? ইরার অনুসন্ধান।

কেন বাদ পড়বে কেন? খাবো তো আলবৎ! কচি-পাঁঠা বৃদ্ধ-মেষ—দইয়ের মাথা—ঘোলের শেষ। প্রাণকেষ্ট থেমে থেমে আওড়ায় আর তার ভাটার মত চোখে ক্রমান্বয়ে ইরা নিরঞ্জন-মহিমা হয়ে অবশেষে রোরুদ্যমানা অনিমার ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়। কী ভেবে অবশেষে বলে: না ঘোল আমি খাবো না। ঢের ঘোল খেয়েছি।

খাব খাব তো বলছো—খাচ্ছো কই? ইরার খুব মজা লাগে: মেসোমশাইকে উৎসাহ দিতে সে উদগ্রীব।

দাঁড়া! আগে কাটি তোদের। বঁটি নিয়ে আসি। এই বলে এক লাফে প্রাণকেষ্ট অন্য ঘরে গেল—এবং পরমুহূর্তেই বঁটি হাতে আরেক লাফে ফিরে এলো! এসেই 'জয় মা কালী—!' বলে

এক বীভৎস আওয়াজ ছাড়ল সে। মাকাল বলি দিচ্ছি, মা কিছু মনে করিসনে দোহাই!

কালী থেকে কালিয়া—কালিয়দমনের কথা তার পরে, কিন্তু ঘটি দেখে আর ঐ কালান্তক নাদ না শুনেই—প্রত্যক্ষ শোনবামাত্র—নিরঞ্জন মহিমাকে, মহিমা ইরাকে, পারস্পরিক হ্যাঁচকার এক টানে—টেনে নিয়ে মুক্ত-দ্বারপথে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে যায়। পরস্পর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখতে পরস্পর সম্বন্ধ হয়ে দৌড় মারে, দাঁড়ায় না আর।

প্রাণকেষ্ট তবু পিছু পিছু যায়। কিছুদূর পর্যন্ত। তার মুখে এখন রবীন্দ্রনাথ—

"উজাড় করে নাও হে আমার যা কিছু সম্বল--
ফিরে চাও, ফিরে চা-ও, ফিরে চাও হে চঞ্চল!"

প্রাণকেষ্ট গান গাইছে! যার গলা কখনো সুড় সুড় করেনি সে সুরেলা হোলো? তবে সত্যিই তার ক্ষেপে যেতে বাকী নেই—অনুর কান্না আর বাধা মানে না!

প্রাণকেষ্ট ফিরে এলো। কিন্তু চঞ্চলরা ফিরলো না, ফিরে তাকালো না পর্যন্ত। বঁটি রেখে হাঁপ ছেড়ে আরাম চেয়ারে গিয়ে কাৎ হয়ে পড়লো সে। আরাম করে ছড়িয়ে পড়ল শ্রাবণের মেঘের মতন।

তারপর আস্তে আস্তে সেই মেঘলা কাটলো। দক্ষিণ হাওয়ার মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস বইলো ওর। —আর ওরা ফিরবে না। এ জন্মে নয়।...আঃ বাঁচা গেল।

প্রাণকেষ্টর সহজ গলা শুনে চোখের আঁচল সরালো অনু। বাদলার পর্দা ফাঁক হয়ে আলোর ঝিলিক দেখা গেল সেখানে। সেখানেও।

আমিও বাঁচলাম। অনু বললে।

আমার কালকের কেনা টাটকা টুথ ব্রাশটা নিয়ে গেল...যাকগে।

আত্মীয়তা থাকলে অমন কতো যায়। সুটকেশ আর হোলড-অল দুটো রেখে গেছে···মন্তর টন্তর না ফুঁকেই পাওয়া গেল—সেইটেই লাভ!

অনু হাসল! কেন হাসল সেই জানে।

কিন্তু যাই বলো, ইরা মেয়েটি বেশ। প্রাণকেষ্ট শেষ কথা বলে।

ফিরে চা আআ আআ—আও হে··কিন্তু যতই 'আও' বলে ডাকুক, সুব বাড়িয়ে সাধা হোক, তারা আব ঐ আওতাব মধ্যে আসেনা।

॥ এর দাদা আর ওর দিদি ॥

অমল চিলেকোঠায় তার পড়ার ঘরে বসে একমনে কি লিখছে, এমন সময়ে তলার থেকে বুবুর গলা কানে এল।

—অমল, অমু—এই অমলা।

ছাদের কার্ণিশ থেকে মাথা বাড়িয়ে সে সাড়া দ্যায়। —ওপরে আয়।

বুবু তিন লাফে তেতলা পেরিয়ে আসে।

—কিরে, এত সকালে যে?

বুবু সে-কথার জবাব দেয় না। —কি। এখনো তোর শেষ হয়নি লেখাটা?

—উঁহুঁ! সাবজেক্ট ঠিক করতেই কি কম মাথা ঘামাতে হয়েছে!

—আমি তো কি নিয়ে লিখব, এখনো ঠিক করেই উঠতে পারিনি। বুবু প্রকাশ করল। —বাপু, কম্পিটিশনের 'এসে' লেখা কি চাট্টিখানি!

—বলিস কিরে, এখনো লেখাই শুরু করিসনি? অমলের চোখ প্রায় কপালে ওঠে। —কাল যে সাবমিট করার শেষ দিন রে!

—তা কি করব! লিখতে হবে 'অন সাম নিউ সাবজেক্ট'—এই 'কণ্ডিশন'। তা অত নতুন সাবজেক্ট পাই কোথায়? বুবু একটু থামে।—তা এবারকার মেডেলটা তুইই নে না-হয়।

অমল এক গাল হাসে। —তা নেব বোধ হয়। তার চোখে নিঃসংশয়তার চাকচিক্য।

—কি সম্বন্ধে লিখেছিস দেখি? বুবু আগ্রহ প্রকাশ করে।

—গরু সম্বন্ধে।

—গরু? বুবু আকাশ থেকে পড়ে। —বলিস কি, য়্যাঁ? তার পরে দম নেবার জন্য একটু থামে। —গরু কি একটা নতুন সাবজেক্ট হোলো?

—দাদার ঠিক করা সাবজেক্ট। দাদা বলে সাবজেক্টের আবার নতুন পুরাতন কি? সবই নতুন আবার সবই পুরোনো। লিখতে পারলেই হোলো। দাদা বলে·। অমল চোখ-কপাল কুঁচকে স্মৃতিশক্তি আলোড়নের চেষ্টা করে। —কি একটা বেশ ভালো পদ্য বলল, মনে কবি দাঁড়া। হ্যাঁ—

'সেই পুবাতন ডালে পুরাতন কাকে
পুবোনো আওয়াজ ছাড়ে নতুন প্রভাতে।'

—কবিতাটা আমাব জানা-জানা, কোথাও শুনেছি যেন মনে হচ্ছে। যাক গে··। বুবু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। —কিন্তু বাপু, প্রভাতটা নতুন হোলো যে?

অমল দমে না। —হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো প্রভাত দুপুবে, দুপুব বিকেলে, বিকেল বাত্রে বদলে যায়। নতুন জিনিস টেকে না। কিন্তু পুরাতন ডাল, কাক আর ডাক তিনটেই টেকসই। কথাগুলো ভালো ভালো, রচনার মধ্যে কোথাও লাগিয়ে দেব ভাবছি কিন্তু লাগাবাব জায়গা পাচ্ছি না।

—তোর দাদার কথা বুঝি?

—হুঁ। অমল গর্বেব সঙ্গে জবাব দ্যায়। —আমার দাদা একজন কথাশিল্পী, জানিস?

বুবু ঘাড নাড়ে। —জানি: কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প লেখে। দিদি পড়ে বলে, কিচ্ছু হয় না।

অমল চটে যায়। —তোর দিদিরও যা সব কবিতা বেরোয় একদম রাবিশ। দাদা আমাকে কদ্দিন বলেছে তোর দিদিকে বলতে। তুই বলে দিস।

রাগের মাথায় অমল ঠিক সত্যি কথা বলে না। ওর দাদা অনেকদিন ওর কাছে বুবুর দিদির কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। এমনকি, বিশেষ করে বলে দিয়েছে পর্যন্ত—যে তার কবিতার অভিমতটা বুবুর দিদিকে ভালো করে জানিয়ে দেয় এবং ঐ সঙ্গে সুযোগ পেলে দাদার গল্প সম্বন্ধেও তার মতটা সুকৌশলে সংগ্রহ করে আনে। কিন্তু এমনি মন অমলের যে, বুবুর বাড়ি গেলে, তার সমস্তটাই যেন একেবার ক্যারমবোর্ডের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কাব্য আলোচনার জন্য কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

বাড়ি ফিরলে দাদা জিগ্যেস করেন, কিরে, গেছলি বুবুদের বাড়ি ?

—এতক্ষণ ছিলাম তো।

- বুবুর দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

-বাঃ, বুবু, বুবুর দিদি আমরা সবাই ক্যারম খেলছিলাম এতক্ষণ !

প্রসন্ন প্রত্যাশায় দাদার মুখ ভরে ওঠে। —তা, বলেছিলি কবিতার কথাটা ?

--ঐ, যাঃ, একদম ভুলে গেছি। ক্ষণেকের জন্য মুষড়ে পড়েই অমল চাঙ্গা হয়ে ওঠে। —কিন্তু দাদা, বুবুর দিদিকে আজ পরপর তিনবার নীল গেম দিয়েছি, জানো !

কিন্তু অমলের দাদা মুষড়ে পড়েন। —দূর ! তোর একদম মেমারি নেইকো। কি করে যে পাস করবি তাই ভাবি। ভাইয়ের সম্বন্ধে আন্তরিক হতাশা গোপন করা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে।

অমল অনুযোগ করে—ওর দিদিরও মেমারি নেই বলো ! সেও তো তোমার গল্পের কথাটা তুলতে পারে ? তাহলেই তো আমার সব মনে পড়ে যায়। তোমার ওপিনিয়নটাও ওকে জানিয়ে দিই ; ওরটাও জেনে নিই। কিন্তু দাদা, সত্যি বলছি, একদিনও তোমার গল্পের সম্বন্ধে একটা কথাও জিগ্যেস করে না।

—কোনো শিক্ষিত মেয়ে কি সাহিত্য আলোচনা করে কখনো; জিগ্যেস না করলে? তুই কি আমার গল্পের কথা তুলেছিস যে বলতে যাবে? দায়ে-পড়ে সাহিত্যিক আর গায়ে-পড়ে সমালোচনা সে কেবল পুরুষদেব মধ্যে।

'দায়ে-পড়ে' আর 'গায়ে-পড়ে'—কথা দুটো অমল মনে রাখবার চেষ্টা করে, গরুর কিংবা না-হলে নিদেনপক্ষে কোনো ঘোড়ার রচনা লিখলেও দাদার উক্তির উক্ত লাইনটা যুতমত কোথাও লাগিয়ে দেবে, ভেবে রাখে। দাদাকে আশ্বাস দ্যায়। —কাল ঠিক বলব, তুমি দেখো।

—কি বলবি মনে আছে তো?

অমল প্রবল ঘাড নাড়ে। —হ্যাঁ আছে।

—কি বল তো?

খানিকক্ষণ মনে করার দুশ্চেষ্টা করে অমল বলে, সে হবে এখন। কাজের সময়ে তখন ঠিক মনে পড়ে যাবে। আমার বেশ মনে আছে, কতকগুলো কথা তালগোল পাকিয়ে বলে দিলেই হোলো।

—ছাই হোলো। নাঃ, তোর মস্তিষ্কের অবস্থাটা ঠিক বর্ধমান নয়। বর্ধমানে একটা স্টেশন আছে তার নাম মেমারি স্টেশন। সেই স্টেশনটারই অভাব তোর মাথায়। কিছু হবে না তোব।

অমল মেমারি স্টেশনেব ব্যাপারটা মনে মনে নোট করে। যদি কোনো রচনায় নাই লাগানো গেল, ক্লাসের কারুর মাথাব ওপরে কথাটার সদ্‌গতি করা যাবে। ওর নিজের কিছু হোক নাই হোক, তা নিয়ে দুর্ভাবনা বা দুঃখবোধেব চেয়ে দাদাব সম্বন্ধে ওব গর্ববোধ বেশি। কি রকম সব চোস্ত কথা,—দাদা নয় তো, যেন চলন্ত ডিক্সনাবী। চলন্তিকা একখানা! অমল যত শোনে তত বোঝাবার চেষ্টা করে, যত কম বোঝে ততই ওর বিস্ময়েব অন্ত থাকে না।

—বলছি, ভাল করে শোন। এইবার নিয়ে ত্রিশবার বলা হোলো।

যদি না মনে থাকে কাগজে টুকে নিতে পারিস, আর তা ছাড়া মুখস্থ করতেই বা কতক্ষণ লাগে। বলবি—

অমল ভালো রকম উৎকর্ণ হয়, দাদার কোনো বাণী ভুলে যাওয়া ভয়ঙ্কর অপরাধ। সে অপবাধ এবার সে স্খলন করবেই. একেবারে বদ্ধপরিকর।

—বলবি যে, আমাব দাদা বলেছেন, আর আমার দাদা একজন উঁচুদরের কথাশিল্পী, তিনি আপনাব কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন যে এতদিন বঙ্গবাণীর পদ্মবনে মত্তহস্তীব সিংহনাদই শুনে এসেছি, কিন্তু এতদিন পরে বীণাপাণির বাণীমূর্ছনায়—

অমল ঘাড় নেড়ে সায় দ্যায়। —ববুব দিদিকে আমরা তো বীণাদি-ই বলি।

—তবে যে অঞ্জলি দেবী বলে কবিতায় লেখে?

—অঞ্জলি হোলো গে ভালো নাম, বীণাদি খাবাপ নাম।

—তাহলে তো ভালোই, বেশ মিলে গেছে। এখন মন দয়ে শোন্ সব হয়তো ভুলে গেলি আবাব। বলবি যে আমার দাদা বলেছেন, আর আমার দাদা একজন উচুদবেব কথাশিল্পী, তিনি অপনাব কবিতা সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন যে এতদিন বঙ্গবাণীব পদ্মবনে মত্তহস্তীব সিংহনাদই শুনে এসেছি, কিন্তু এতদিন পরে বীণা-পাণির বাণীমূর্ছনায় যথার্থ কাব্যপাবমলের আলোক আস্বাদ করলাম। কেমন, মনে থাকবে তো?

অমল বাক্যটা ধারণ করবাব চেষ্টা করে, কিন্তু সংশযের ধারণা তাব থেকেই যায়। —মত্তহস্তীব সিংহনাদটা বাদ দিলে হয় না দাদা? ওটা ভারি জোর সমস্কৃত।

ঐটেই হোলো আসল। ওটা গেলে আর থাকল কি?

—আচ্ছা ওর বদলে পাগলা হাতীব চিঁহিঁ চিঁহিঁ বললে হয় না?

সব মাটি করল দেখছি। সমস্ত মানেই ওলট পালই হয়ে যাবে তাহলে। আমি 'সিংহনাদ' ছাড়তে পারি না, তবে যদি তোর সুবিধা

হয় মনে করিস 'পদ্মবনের' জায়গায় বং গুলবাগিচা করতে রাজি আছি। তাহলে হবে,—বঙ্গবাণীর গুলবাগিচায় এতদিন মত্তহস্তীর সিংহনাদ—।

—আচ্ছা, ঠিক বলে দেব। মত্তহস্তীব সিংহনাদ—এইতো? অমল দাদাকে উৎসাহ দেয়।

দাদা বিশেষ ভরসা পায় না। —উহুঁ, কথাটা তুই মুখস্থ করে ফ্যাল। যখন খটকা লেগেছে, তখন গোলমাল হতে কতক্ষণ?

অমলকে বাধ্য হয়ে বিড়বিড় করে মত্তহস্তীর সিংহনাদ ছাড়তে হয় পাঁচ ছ ডজন, তবে দাদার কাছ থেকে রেহাই পায়।

কিন্তু পরের দিন আবার সেই দশা! বুবুর ওখানে মত্তহস্তীর কথা একদম ভুলে গিয়ে ক্যারম নিয়ে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বাড়ি ফিরে ফেব দাদার 'সিংহনাদ' শুনতে হয়।

এইসব কারণে অমল বিরক্ত হয়েই ছিল, এখন বুবুর কথায় হ্যারিকেনের বার্ণারে যেন কেরোসিনের ছিটে লাগে। সে দপদপ করে জ্বলতে থাকে। —হ্যাঁ, বলে দিস অ্যাদ্দিন আমরা বাংলা সাহিত্যে বেশ আরামে বসবাস করছিলাম, কিন্তু যেদিন থেকে না তোর বীণাদি কবিতা লিখতে শুরু করেছে সেদিন থেকে আর শান্তি নেই। কবিতার সিংহনাদ না শুনে যত বাজ্যের হাতি ঘোড়া সব খেপে গিয়ে হরদম কেবল মূর্চ্ছা যাচ্ছে। আমার দাদা তোর দিদির কবিতা পড়েও না। দেখতে পেলে ছিঁড়ে ফ্যালে। ওরকম বিশ্রী লেখা আবাব পড়ে মানুষ?

দম নেবার জন্য অমল একটু থামে। বুবু কি বলবে ভেবে পায় না। অমলের বক্তৃতা তাকে রীতিমত ঘাবড়ে দ্যায়।

—হ্যাঁ, একথাও বলে দিস যে আমার দাদা বলেছে। আর আমার দাদা একজন কথাশিল্পী। খুব উঁচু—উঁচু, হুঁ, খুব উঁচু ডালের।

—বলবই তো। বুবু জোর গলায় সাড়া দ্যায়। —দিদির কবিতার জ্বালায় আমিও অস্থির। আমার তো পড়াশুনার দফারফা। একটা

লিখে ফেলেছে কি অমনি আমায় শুনতে হবে, না শুনিয়ে ছাড়বে না। দিনরাত যদি পদ্যই শুনব, তো পড়ব কখন? আমি আজই বলব দিদিকে, নিশ্চয় বলব।

বুবুর সমর্থনের সর্বান্তঃকরণতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দিদির উপদ্রবের বিরুদ্ধে কি ভাবে অভিযান করা যায় অনেকদিনই সে কথা ভেবেছে. আজ অমলের দাদার উপলক্ষ গ্রহণ করাই সে সবচেয়ে সমীচিন জ্ঞান করে।

—আর কবিতাও কি কম লিখেছে দিদি? চারটে খাতা বোঝায়। এমনকি, আমাব কি মনে হয় জানিস…? বুবুর কণ্ঠস্বর রহস্যের আবেগে কম্পিত।

অমল উৎকর্ণ হয়ে এগিয়ে আসে—কি?

—ঐ শাক ডাকা কবিতাটা না? যেটা তোর দাদা মুখস্থ করেছে রে…

—হ্যাঁ কি হয়েছে তার?

—আমার খুব সন্দেহ, ওটা আমাব দিদির লেখা।

বাগ্‌যুদ্ধের পর বাগ্‌শান্তি স্থাপিত হয়, বন্ধুকৃত্যেব কথা অমলের মনে পড়ে। প্রাতঃরাশের প্রশ্ন ওঠে।

—ব্রেকফাষ্ট করেছিস, এত সকালে বেরিয়েছিস?

আলোচনাটা ক্রমশ আলোব দিকে ফিরছে দেখে বুবু উল্লসিত হয়।

—একবার খেয়েছি অবিশ্যি. তবে আরেকবার খেতে আপত্তি নেই।

ইলেকট্রিক হীটারে অমল এক কেটলী জল চাপিয়ে দ্যায়। হরলিকসের শিশি, ওভালটিন আর চিনির কৌটো দেরাজ থেকে বার করে। বিস্কুটের টিনটাও টেবিলের ওপর রাখে।

—দেখিস, এবার আমি ঠিক মেডেল মারব ঐ 'এসে'-তে।

কেটলীর জলের মতো, বুবুর মনেও তখন বেশ উৎসাহ জেগেছে সে সতর্ক হয়, এমন কোনো তর্ক তুলতে চায় না যাতে খাদ্য-পানীয়ের দিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

বুবুর নিরুত্তরতায় অমল মনে জোর পায়। —সত্যি, লিখে যা আনন্দ পেয়েছি ভাই, কী বলব। দাদা বলে, লিখে যদি আনন্দ পাস বুঝবি তোর লেখা হয়েছে ফাস্ কেলাস।

বুবু অমলের দাদার কথাটি খাঁটি কিনা মনে মনে খাটাবার চেষ্টা করে। বিস্কুটের টিনটা দেখে অবধি তার মনে অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হয়েছে, বিস্কুটগুলো ফাস কেলাস কি না কে জানে। আসন্ন পরীক্ষার ফল দিয়েই সত্যকার বিচার করবে সুতরাং অমলের একথারও জবাব দিতে সে ব্যস্ত হয় না। আপাতত কথাটাকে আমল দেয় না।

—দাঁড়া, দুটো ডিম নিয়ে আসি দাদার দেরাজ থেকে। হাফ বয়েল হবে। অন্তর্হিত হয় অমল।

বুবু মনে মনে ভাবে, আহা, তার পড়ার ঘরে যদি এরকম একটা হীটার থাকত, তাহলে যখন-তখন চা টোস্ট, ওভালটিন কোকো করে খেতে কী স্ফূর্তিটাই না হোতো! কিন্তু হায় তার তো দাদা নেই অমলের দাদার মতো। তার দাদাই নেই একেবারে। তার বরাতে শুধু এক দিদি, দিদির কাছে যা কিছু সুবিধা সে কেবল সেই ভাই-ফোঁটার দিনটিতে, বছরে বাকি তিনশ চৌষট্টি দিন দিদি কোনো কাজেই লাগে না। কিন্তু দাদা—!

দাদার কথা ভাবতে বুবুর জিভ সরস হয়।

সরস হবার কথাই বইকি! দাদা মানেই যে চপ কাটলেট কেক পুডিং চকোলেট! চানাচুর আর সলটেড অ্যামণ্ড! আইসক্রিম আর সরবৎ! কাজু বাদাম, কমলালেবু আর গোলাপজাম! ফুটবল ম্যাচ আর ম্যাটিনী সার্কাস! বায়স্কোপ এবং আরো কতো স্কোপ। অবশ্যি দাদার মত দাদা হয় যদি! তাহলে ভাই হওয়ার মতন আনন্দ আর নেই। তা না-হয়ে যদি কেবল ভাইকে ধরে ধরে মারে আর

দিনরাত ফরমাস খাটায় তেমন দাদা—দাদা নামের কলঙ্ক; তাকে দাদা না-বলে ওরই সহজ প্রাপ্য সুলভ এবং সর্বপ্রকারে যুতসই মিল দিয়েই সম্ভাষণ করা উচিত।

হ্যাঁ, দাদা বলতে হয় তো অমলের দাদাকে। অমন দাদা পাওয়া আর সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোটর সাইকেল উপহার পাওয়া প্রায় একরকমের সৌভাগ্য! বেচারা অমলেব মা বাবা নেই, এমনকি একটি দিদিও নেই; কিন্তু এক দাদাতেই ওর সব দুঃখ ঘুচিয়েছে।

অমলের দাদা অমলকে যত সব যাবাব মতো জায়গায় আর খাবার মতো জায়গায় সঙ্গে কবে নিয়ে যায়। কত কী উপহার দেয় ওর জন্মদিনে—গল্পের বই আর ছবির বই তো স্তূপাকার হয়ে উঠেছে। রিস্টওয়াচ, ক্যামেবা, সাইকেল, ফাউন্টেন পেন—কী নেই ওব? কত বঙের কত রকমের কত ডিজাইনের জামা কাপড় জুতো! অমল যা চায় তাই পায় দাদার কাছে।

এই বকম একটা দাদা থাকতো ববুব। তাহলে কী মজাই না হোতো!

বুবুর আত্মগত দাদৃভক্তিব আতিশয্যে অকস্মাৎ বাধা পড়ে; ডিম হস্তে অমলের আবির্ভাব হয়। কিংবা অমল হস্তে ডিমের।

—দাদা আরো দিলে, রুটি আব মাখন··

—তুই চাইলি বুঝি? কেন আমার জন্যে এত— ভদ্রতা-সুলভ সঙ্কোচ প্রকাশের প্রয়োজন যেন অনুভব করে বুবু।

—দাদার কাছে কিছু চাইতে হয় না আমাকে। চাইবাব আগেই কেমন করে দাদা টের পেয়ে যায়। কথা-শিল্পী কিনা। দাদাকে সার্টিফিকেট দিতে পেরে আত্মগর্বে অমলেব বুক ফুলে ওঠে।

মুহূর্তের দুর্বলতা বুবু কাটিয়ে ওঠে। —এনেছিস বেশ করেছিস। দে আমায়, কেটে কেটে মাখন মাখিয়ে রাখি ততক্ষণ। জোর ব্রেকফাষ্ট হবে দেখছি।

—যা বলেছিস! দাদাকে গিয়ে বল্লুম, দাদা, আবেকবার ব্রেকফাষ্ট করব, দু চাবটে ডিম নিচ্ছি। দাদা বল্লে, শুধু ডিমে কি হবে। ফার্পো ব্রেড আর পলসনের মাখনের টিনটাও নিয়ে যা ঐ সঙ্গে। আবাব তো আসবি! দাদা এখন গল্প লিখছে কি না, গল্প লেখার সময় ছুটোছুটি পছন্দ করে না!

—ছুটোছুটি করে কি গল্প লেখা যায কখনো? গল্প তো বসে বসেই লিখতে হয। বুবু অমলকে সমর্থন করে।

—আহা, দাদা তো বসেই লেখে। আমাবো ছুটোছুটি করা নিষেধ তখন।

—দিদিব কবিতা কিন্তু ভাই ছুটোছুটি না-করলে বেবোয না

অমল অবাক হয়। —কি রকম? ছুটোছুটি কবে কবিতা?

—সে এক মারামারি ব্যাপাব। কবিতাও কিছুতে আসবে না দিদির মাথায, দিদিও ছাডবে না সহজে। ভাবগুলো আকাশে উডে কি না, অনেকটা পাখীর মতো, অদৃশ্য পাখী গুরুতর কাব্যকথা গম্ভীর মুখে অমলকে বোঝাবার প্রয়াস পায বুবু ধরতে গেলেই তারা উডে পালায, তেডে গিযে ধরতে হয। সারা ছাতময় দিদি তাই পায়চারী করে বেডায। যেমনি একটা লাইন ধরা পডে, অমনি তাকে পাগড়ে এনে খাতায টুকে ফ্যালে, তার পর ফের আবার পায়চারি।

অমল কম বিস্মিত হয় না। —বলিস কি?

—ঐরকম। বাবা হাসেন আব—বলেন, বিনির কবিতার ঠ্যালায় আমাদের বাডি আলগা হয়ে গেল।

আমার দাদা পা নাডে না পর্যন্ত—গল্প লেখার সময়ে।

অমলের দাদার অমানুষিক শক্তির পবিচয়ে বুবু স্তম্ভিত হয। আমার দিদি যেমন পা নাডে, যেমনি হাত নাডে, যেননি ঘাড নাডে, তেমনি আবার মাথা নাডে।

—কই, ক্যারম খেলার সময়ে কিছু বোঝা যায় না তো?

—সব সময়ে কি হয়? বাবা বলেন, কবিতায় পাওয়া একরকম হিষ্টিরিয়া। —যখন ধরে তখন ধরে। অন্য সব সময়ে ভালোমানুষের মতোই!

—ধর, যে সময়ে ব্যায়রামটা চেপে ধরে, তখন যদি পাখি ধরতে গিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়ে যায়?

—আশ্চর্য নয়! পড়ে যাবেও কোনদিন।

—আচ্ছা, এক কাজ করবি। তোর দিদিকে পায়ে দড়ি বেঁধে পায়চারি করতে বলিস। আর দড়িটা ছাদের রেলিংএ শক্ত গেরো দিয়ে বাখিস। গভীর বিজ্ঞতার সঙ্গে অমল উপদেশ দেয়! —হ্যাঁ, তাহলে আর ভয়ের কারণ থাকছে না, ভাব ধরতে গিয়ে চাই কি রেসই করুক, কি হাই জাম্প লং জাম্প যা খুশি দিক। এমনকি কোনো দমকা হাওয়া তোর দিদিকে যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, তার জো-টিও থাকলো না।

—হুঁ তা হয় বটে। বুবু ঘাড় নাড়ে। —ছাতে পাওয়া না-গেলেও, বাড়ির আশে পাশে কোথাও-না-কোথাও দিদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যাবেই। তখন কুয়ো থেকে জল তোলার মতো টেনে তোলো, ব্যস!

অমল অকস্মাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা যারা কবিতা লেখে, তারা তো কবি? যেমন রবীন্দ্রনাথ?

—হুঁ, কেন?

—তোর দিদিও তাহলে একটা কবি? মেয়েরাও কবি হতে পারে তো? তোর দিদিও একটা কবি তাহলে?

—দিদি তো তাই বলে আমাকে।

—আমার দাদাও বলে। কথাটা বলে অমল একটু অপ্রতিভ হয়, শুধরে নেবার চেষ্টা করে। —দাদা বলে না ঠিক, তবে কখনো কখনো ভুলে বলে ফ্যালে। তাহলে এক কাজ করিস।

—কি?

—তোর দিদি যখন ঝুলতে থাকবে সেই সময় চট করে আমায় একটা খবর দিবি।

—কেন বল তো?

—আমি গিয়ে টেনে তুলব।

বুবু বিস্ময়ে হতবাক হয়। —কী হবে তাহলে?

অমল রহস্যটা পরিষ্কার করে। —কোনো কবিকে এ পর্যন্ত কেউ টেনে তুলেছে বলে শোনা যায়নি। বাংলা দেশে তো নয়ই, বোধহয় পৃথিবীতেও না। আমার রেকর্ড থাকবে।

এতক্ষণে বুবুর বোধগম্য হয়। রেকর্ডটা সেও রাখতে পারে, কারণ খবরটা প্রথম তারই পাওয়ার কথা, কিন্তু বন্ধুর জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে সে প্রস্তুত হয়। —আচ্ছা দেব তোকে খবর। নিশ্চয় দেব।

—হ্যাঁ দিস। কবি মানুষকে টেনে তোলা খুব মজার হবে নিশ্চয়। আর তা ছাড়া···। কথাটা প্রকাশ করবে কিনা অমল একটু ইতস্তত করে।

বুবু উদ্‌গ্রীব হয়। —কি, বল না।

—দাদা প্রায়ই বীণাদির ফটো চায়। একটা কামেরাই আমায় কিনে দিলে ঐ জন্যে। কিন্তু বীণাদির ফটো তোলার কথা আমার মনেই থাকে না। রোজ ভাবি, যখন তোদের বাড়ি যাব, ক্যামেরা নিয়ে যাব, আর রোজ রোজই ভুলে যাই। খেলতে বেরুলে আর কিছুই আমার মনে পড়ে না।

—কেন, আমার তো তুই অনেক ফটো তুলেছিস।

—কুড়িখানা। তা তোর কুড়িখানা ফটোই আমি দাদাকে দিতে চেয়েছিলাম বীণাদির ফটোর বদলে। দাদা কিন্তু নিতে রাজি হয় না, বলে তোর বন্ধুর ফটো, তুই রেখে দে।

—আমার সেই হাফপ্যাণ্ট-পরা এয়ারগান হাতে বুক ফোলানো ফটোখানা দেখিয়েছিলিস?

—হ্যাঁ সেখানাও।

—নিলে না? আশ্চর্য! ওর চেয়ে ভালো ফটো আবার হয় নাকি? দিদির ফটো আর এমনকি অদ্ভুত হবে?

—তাই তো আমি ভেবে পাই না! দাদার তো আমি তেষট্টিখানা ফাটো তুলেছি···

—দেখেছি, অনেক ডিফারেণ্ট পোজে, খাচ্ছে, গল্প লিখছে, মাথা চুলকাচ্ছে, দাঁত খুঁটছে, কলম কামড়াচ্ছে, আপন মনে নিজের কান মলছে, নিজেই নিজের কান মলে দিচ্ছে, আবার নাকে নস্যি দিয়ে হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ···

বুবুর তালিকাটা অমল সংক্ষিপ্ত করে আনে। —হ্যাঁ, কত রকম। তবু দাদা খুশি নয়। তাই তোকে বলছি কথাটা মনে রাখতে।

—আচ্ছা রাখব।

—আমি ভারী ভুলে যাই কি না! যখন তোর দিদি ঝোলার খবরটা নিয়ে আসবি এখানে, তখন—তখনই ক্যামেরার কথাটাও মনে করিয়ে দিবি আমায়। বুঝলি?

—বেশ।

—টেনে তোলার আগে তোর দিদিব একটা ফটো তুলে নেব।

—তোর দাদাকে দেবার জন্যে?

—হুঁ। পোজটা নেহাৎ মন্দ হবে না, কি বলিস?

—চমৎকার হবে। ফটোর তলায় লিখে দিস, 'কবিতার খাতা হস্তে দোদুল্যমান'—উঁহু দুলবে না তো—লিখবি, কবিতার খাতা হস্তে ঝোঝুল্যমান বীণাদি। বুবু খুব উৎসাহ প্রকাশ করে। সে বেশ হবে। কল্পনা নেত্রে সেই দারুণ মজার দৃশ্যটা যেন সে প্রত্যক্ষ দেখতে পায়।

বন্ধুর আশ্বাসে এতক্ষণে অমল কিছু পরিমাণে নিশ্চিন্ত হতে পারে। আরামের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দ্যায়। বলে, দাদা ভারি খুশি হবে, ফটোটা পেলে।

উচ্ছ্বসিত জলের কেটলীটা টেবিলের উপর রেখে অমল বলে, দুটো ডিম হাফ বয়েল করা যাক। আর দুটো ডিমের পোচ করি, কেমন?

বুবু আন্তরিক সহানুভূতি জানায় এ-প্রস্তাবে।

গরম জল ভর্তি কাপের মধ্যে দুটো ডিম সন্তর্পনে রেখে, হীটারের উপর মাখনাক্ত প্যান চাপায় অমল। খুব সামান্য মাখন দেব কিন্তু, দেখবি কেমন ফাস্ কেলাস পোচ হয়।

—খেয়ে আনন্দ হলেই বুঝতে হবে পোচ ফাস্ কেলাস হয়েচে। বুবু যোগ দ্যায়।

অমল উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। বুবুর জবাবটা যেন জানা-জানা, কথাটাকে তারই উত্তরাধিকৃত সম্পত্তি বলে যেন সন্দেহ হয়। —এ জবাবটা তোর নিজের নয়, কোথায় পেলি একথা? আমার দাদার কথা থেকে চুরি করেছিস।

বুবুর রাগ হয়, দাদার সব-কিছুর মতো দাদার কথা যেন অমলের আমলের মধ্যে—ওরই নিজের বৈষয়িক ব্যাপার—তাতে আর কেউ হাত দিতে পারে না। অথচ এ জবাবটা তারই নিজস্ব মাথা খাটিয়ে বের করা প্রায়। সে বলে, কেন, তোর দাদা ছাড়া আর কেউ কথা বলে না?

—বলবে না কেন? নিজের কথা বলতে তারা জানে না, বাক্য ব্যয় মাত্র। বুবুর উষ্মা দেখে অমল হাসে। —অকারণে অনর্থক বাক্য ব্যয় করে যায়। আরো চারটে ডিম অনলে হোতো। —দুটো সেদ্ধ আর দুটো আমলেট—বেশ হোতো কিন্তু, কি বলিস?

—ঘোড়ার ডিম হোতো। বেশ জোরের সঙ্গে জবাব দেয় বুবু। —এটাও কি তোর দাদার কথা? বলে দে না-হয়। বলে দিলেই হোলো তো। তোর দাদার বার করা ঘোড়ার ডিম, বলে ফ্যাল।

—আহা, রাগ করিস কেন, দাদার কতকগুলো বাছা বাছা কথা তোকে ইউজ করতে দেবো—তুই 'এসে'-তে লাগাস। খুব নম্বর পাবি। অমল বন্ধুর সঙ্গে রফা করতে চায়।

বুবু গোঁজ হয়ে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

রাগ ভাঙাবার যে কৌশলটা ভালো জানা আছে, তাই প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে করে অমল। দ্যাখ তো কি রকম হয়েছে পোচটা? প্যান থেকে কাঁটায় করে আশ্চর্য নৈপুণ্যে একটি পোচ তুলে নেয়, বুবুকে হাঁ করতে বলে। অমল জানে, এর চেয়ে সদ্য ফলপ্রদ অব্যর্থ উপায় আর নেই। দাদা এই করেই অমলের রাগ ভাঙিয়ে থাকে। রাগান্বিত ব্যক্তিকে হাঁ করতে বলো আর অমনি চকোলেট, কি টফি কি সন্দেশ বা কোনো সুখাদ্য টফ করে মুখের মধ্যে ফেলে দাও—এক মুহূর্তে সব একেবারে জল। অবশ্যি সেই রাগান্বিত ব্যক্তির হাঁ-এর মধ্যে ফেলতে হবে। নিজের মুখে দিলে চলবে না—এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কেননা খাদ্যদ্রব্যের কেমন এক বদখেয়াল আছে, কোথায় যেতে কোথায় চলে যায়।

দাদা বলে মনের মধ্যে রাগ হলে মুখের মধ্যে একরকম গ্যাস জমে। হাঁ করলে তা অবশ্যি দেখা যায় না, যেহেতু গ্যাস মাত্রই হচ্ছে অদৃশ্য। সেই সময়ে কোন মিষ্টি জিনিস মুখে পড়লে গ্যাসোদগম স্থগিত রাখে —তার মানেই রাগ পড়ে যাওয়া।

পোচটা মুখের মধ্যে নিয়ে বুবুর সংক্ষিপ্ত আর্তনাদ শোনা যায়। সেই মুহূর্তে সেটাকে সে গিলে ফ্যালে, ধারাবাহিক চর্বনের দ্বারা তার রসাস্বাদের বিন্দুমাত্র দুশ্চেষ্টা করে না।

—নাঃ ফাস্ কেলাস নয়, খেয়ে আনন্দ হোলো না মোটেই। উঃ, কি গরম, বাপ, মুখটা পুড়েছে।

—তোর মুখ কোনো কাজের নয়। এর চেয়ে গরম চা খাই আমরা।

—চা খাওয়া যায়, চা হচ্ছে গিলতাব্য জিনিস, পোচ তো তা নয়।

অমল আর কথা বাড়ায় না, কেননা বুবুর মুখেরমধ্যে আবার গ্যাসের সঞ্চার হতে পারে সেক্ষেত্রে আর একটি মাত্র পোচ অমলের সম্বল, সেটা তার নিজের শেয়ারের, কাজেই অমলকে সাবধান হতে হয়।

দুটো কাঁচের গেলাসে গরম জল ঢালে অমল, তাতে হরলিকসের গুঁড়ো আর চিনি মিলিয়ে দুচামচ করে ও ওভালটিন মেশায়। একটা গেলাস এগিয়ে দেয় বুবুর দিকে। —অনেকটা কোকোর মত খেতে নারে? খেলে খুব লিখতে পারা যায়, তাই দাদার ভারী পছন্দ।

এক চুমুক খেয়ে বুবু বলে, তোর দাদার খুব ভালো পছন্দ!

দাদার প্রশংসায় খুশী হয়ে এক পিস রুটি বেশী দিয়ে ফ্যালে বুবুকে। —দাদা কি কি বলে জানিস বুবু? যতই ব্রেকফাষ্ট করো না কেন ফাষ্টকে কোনোদিন ব্রেক করতে পারবে না। উপবাসকে কখনো ভাঙা যায় না; যতই ভাঙবে ততই ওর জোর বাড়বে। আরো অনেক কথা বলে দাদা সে সব সহজে মুখে আসে না, মনে করে বলতে হয়।

ড্রয়ার থেকে অমল একটা নোটবই বার করে। —দাদার সব ভালো ভালো কথা আমার টোকা থাকে, যখন সময় পাই একবার করে পড়ি। এক একদিন যা মজা হয়—

মজার কথায় বুবু সোজা হয়ে বসে। —কি রকম?

—দাদা তো জানে না যে আমি দাদার কথাশিল্পগুলো টুকে রাখি আর মুখস্থ করি। এক একদিন দাদার কথাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে এমন অবাক করে দিই দাদাকে!

—দাদা কি বলে শুনে? সেদ্ধ ডিমে কামড় দিতে দিতে বুবুর জিজ্ঞাসা।

—কি রকম যেন বিষণ্ণ হয়ে যায়, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ঘাড় নাড়ে আর বলে, দুর্লক্ষণ আছে দেখছি, তোর মধ্যেও আছে। তুইও না কথাশিল্পী হয়ে পড়িস। আমার ভারী ভয় হয়।

—ভয় কিসের?

—আমিও তো সেই কথাই বলি, 'ভয় কিসের'? দাদা বলে ভয়ঙ্কর রকমের ভয়। থাইসিস হওয়া আর কথাশিল্পী হওয়া সমান মারাত্মক। আমি বলি, বাঃ, তুমি হয়েচ যে। দাদা জবাব দ্যায় আমি কি আর

সাধ করে হয়েছি রে! থাইসিস হলে আর উপায় কি, কিন্তু ভাই বন্ধুর হলে সহ্য করা যায় না।

—কুকুরে কামড়ালে যেমন ফুঁড়ে ছায়, অ্যান্টি টিটানাস না কি, তেমনি কথাশিল্পে কামড়ালে কোনো ইনজেকশন নেই? বুবু কৌতুহল প্রকাশ করে। —অ্যান্টি কথাশিল্পীক কিছু? কোনো ডাক্তারকে জিগ্যেস করব না-হয়।

—দাদা জিগ্যেস করেছিল। ডাক্তার বলেছে, ছেলেবেলায় খারাপ স্বাস্থ্য থেকে সাহিত্যিক জন্মায়। তাই আমার জন্যে কডলিভার, কালজানা আর কোয়েকার ওটস আনা হয়েছে। আমি দেরাজে রেখে দিয়েছি, ওই পর্যন্ত—ভুলেও—ছুঁই না ভয়ে। ওসব খেলে নাকি আমার হাড় শক্ত হবে, গায়ে রক্ত হবে, আর মাথা পোক্ত হবে।

রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বুবু বলে, কেন তোর হেলথ বেশ ভালোই তো।

—আরো ভালো হবে। পোচটাকে সমাদরে রুটির টুকরোর উপর ছড়িয়ে দিয়ে উভয়কে একসঙ্গে মুখের মধ্যে অভ্যর্থনা করে অমল। —দাদার ইচ্ছা আমি নামজাদা ডাক্তার কি খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার কিম্বা কলকাতার মেয়র-টেয়র এমনি একটা কিছু হই। আমি কিন্তু কী হতে চাই জানিস?

মাখন-রুটিতে বুবুর মুখ জোড়া, প্রশ্নের অবকাশ পায় না, ইঙ্গিতের দ্বারা উৎসুক্যের ভাব প্রকাশ করে।

—আমি কথাশিল্পী হতে চাই দাদার মতো। আমার দাদা যা হবে আমি তাই হব।

বুবু দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়ে। —কিন্তু দিদি যা-যা হবে তা হবার উপায় নেই আমার। পদ্য-টদ্য আমার আসেই না। অনেক চেষ্টা করেছি, কথাগুলো কিছুতেই মিলতে চায় না।

—এমন আর শক্ত কি। অমল বলে, দিল্লীর সঙ্গে বিল্লী মিলিয়ে দে—

—উঁহুঁ, দিল্লীর সঙ্গে লাড্ডু হবে। দিল্লীতে লাড্ডু মেলে।

—মিললো, কই তাহলে? দিল্লীর সঙ্গে বিল্লী—মানে না-হোক, মিল হলেই হোলো। আর মানেই বা না-হবে কেন? এই বেড়াল বেহারে গেলেই বিল্লী হয়ে যায়। বিল্লী মানে হচ্ছে খোট্টা বেড়াল। তারপর—তালশাঁসের সঙ্গে কালোহাঁস।

বুবুও উৎসাহিত হয়! —তালকানার সঙ্গে নাককানা।

—নাক আবার কারু কানা হয়? তালকানার সঙ্গে হোলো কালজানা; ডাক্তার তালকানা, খেতে দিল কালজানা। ছাখ কেমন পদ্য হয়ে গেল। এইরকম দশ বারো কি কুড়ি লাইন পর পর লিখতে পারলেই যে কোনো কাগজে ছাপতে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

বুবু আশঙ্কা প্রকাশ করে! —তুই কথাশিল্পী তো হবিই—আবার ছাখ কবি না-হয়ে যাস! দিদির সঙ্গে তোর ভয়ানক মিলে যাচ্ছে।

—কবি হতে আমি চাই না! কবি আবার মানুষে হয়? তা ছাড়া কবি হতে গেলে যেরকম ছাতময় ছুটোছুটি করতে হয় তুই বললি, সে বাপু, আমার পোষাবে না। আমি দাদার মতো গল্প লিখব বসে বসে।

—কবিদের কিন্তু নাম বেশি। আমাদের সাহিত্যপাঠে কতগুলো পদ্য বল তো? গল্প কিন্তু একটাও নেই।

বুবুর কথাটা অমল বিবেচনা করে ছাখে। —আচ্ছা, দাদাকে বলে দেখব। দাদা যদি কবি হতে রাজি হয় তাহলে না হয়—! নোট-বইটার একটা পাতায় অমল নিজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। —দাদার কথাটা শোন এখন। ব্রেকফাস্ট করার সম্বন্ধে। খুব ভীষণ দামী কথা।

বুবু উৎকর্ণ হয়। উদ্যত ওভালটিনের গ্লাস নামিয়ে রাখে।

—হ্যাঁ, তোকে বলছিলাম না? নোটবুক থেকে পড়তে থাকে অমল। —উপবাসকে কখনো ভাঙা যায় না, যত ভাঙবে, ততই ওর জোর বাড়বে। ততই ওকে আবার ভাঙতে হবে এবং ততই হবে

ও আরো জোরালো। বলতে গেলে, ভাঙা ভাঙা উপবাসের টুকরোগুলোকে জোড়া দেওয়ার নামই আমাদের জীবন? ঐ কাজের জন্যেই বেঁচে আছি! যেদিন উপবাস আর আমাদের ভাঙতে হয় না, সেদিন আমরা নিজেরাই ভাঙা পড়ি, পৃথিবীর বাস —এই উপনিবাস—কিম্বা উপনিবেশ—আমাদের তুলতে হয় সেদিন।

বুবু এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাসটা মুখে তোলে।

অমল তাকায় ওর দিকে। —মানে বুঝলি কিছু?

---একদম না।

—আমিও কিছু বুঝিনি। অমল স্বীকার করে। —কিন্তু কথাগুলো খুব ভালো। কোথায় লাগানো যায় বলতো?

—হেডপণ্ডিতের টিকিতে।

—টিকিতে। আনাকাঙ্খিত উত্তরে অমল হাঁ হয়ে যায়।

—টিকিতেই তো লাগাতে হবে! তাহলেই চোখে পড়বে পণ্ডিতের। মাসের মধ্যে পনের দিন উপোস করে মরে, একটা তিথি-পর্বের একটা ছুতো হোলো। শিক্ষা হবে বেচারার!

বুবুর প্রস্তাবটা প্রণিধান করে অমল। —দূর আমি বলচি, কোনো রচনায়-টচনায় লাগানো যায় কিনা!

—টিকিও তো একটা রচনা। হেডপণ্ডিতের টিকি হেডপণ্ডিতের নিজের রচনা।

বুবুর কথা অমলের মনঃপুত হয় না। —উঁহুঁ, সে হয় না।

হবার দিকে যে অনেক বাধা বিপত্তি আছে, বুবু সেকথা মেনে নেয়। হেডপণ্ডিত যে জ্ঞান থাকতে নিজের রচনায় অন্য কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন, একথা কখনই ভাবতে পারা যায় না। তবে নাকে নস্যি দিয়ে চেয়ারে কাৎ হবার পর তাঁর ঘুমের সুযোগ নিয়ে রচনায় রচনায় যোগাযোগ সম্ভবপর হলেও হতে পারে। কিন্তু অতখানি সৎসাহসের পরিচয় দিতে অমল প্রস্তুত নয়—দাদার বাণী প্রচারের জন্যও না।

—'এসে' কম্পিটিশনের একজন বিচারক আবার হেডপণ্ডিত। এই মারাত্মক সত্যে বুবুর মনোযোগ সে আকর্ষণ করে।

—তাহলে টিকিতে কথাশিল্প লাগায়েচে কি, তোমার মেডেলের দফা-রফা। অমল সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে, উহুঁ ওঁকে বেগড়ানো ঠিক হবে না।

—আরো মুস্কিল এই যে, তোর 'এসে'-র সাবজেক্ট যে নতুন। এমনিতেই হেডপণ্ডিত একথা মানতে চাইবেন না, তার ওপরে আবার যদি টিকিতে গোলমাল বাধে—ওঁর নিজের রচনাও গুলিয়ে যায়···

—পাগল? সাবজেক্ট সম্বন্ধে আমি একদম নিশ্চিন্ত···

—বিচারকদের মানতেই হবে যে গরু একটা নতুন বিষয়?

—আলবৎ। অমল যা কিছু জোর সমস্ত তার কণ্ঠে প্রয়োগ করে। —গরু চির-পুরাতন আবার চিব-নূতন। গরু চিরন্তন—

দাদার কথাটা এই অজুহাতে চালানোর সুযোগ পেয়ে আন্তরিক আহ্লাদিত হয় অমল। বুবুর বিস্ময়ে বদন ব্যাদন করে থাকে।

—গরুর তুই কি জানিস? অমল বসেছিল, সহসা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে; হাত পা নেড়ে আওড়াতে সুরু করে দ্যায়—

গরু অনাদি,—গরু অব্যয়,

গরু বিশ্বের চির বিস্ময়,

জগদীশ্বর ঈশ্বর সে যে পুরুষোত্তম সত্য,

গরু তাথিয়া তাথিয়া নাচিয়া নাচিয়া ফিরিছে স্বর্গমর্ত্য!

শেষের লাইন আবৃত্তির সময় উদয়শঙ্করের অনুকরণের অভ্রভেদী চেষ্টা করে অমল। কড়িকাষ্ঠস্পর্শী লম্পঝম্ফ লাগিয়ে দ্যায়।

ইলেকট্রিক আলোর সুইচ টিপতে গিয়ে কথা নেই বার্তা নেই, শক খেলে লোকে যেমন ভড়কে যায়, অমলের আকস্মিক উত্তেজনায় বুবুর তেমনি চমক লাগে। কী না জানে অমল! যৎকিঞ্চিৎ যে গরু তার সম্বন্ধেই বা কম কি? তার চোখের সামনে যেন অগাধ জ্ঞানের সমুদ্র ঢেউ খেলিয়ে নাচছে, এবং সে তার তীরে বসে নিউটনের মতো

দু-একটা নুড়ির টুকরো কুড়োতে পারছে মাত্র। অমলের অপরিসীমতার সঙ্গে নিজের অজ্ঞতার অসামান্য সামান্যতার তুলনা করে ওর দুই চোখ ম্লান হয়ে আসে। নিজেকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে তার মনে হতে থাকে।

বাস্তবিক, কী অদ্ভুত অমল। কোনদিন ও যেন ফুরোয় না, প্রতি মুহূর্তেই নতুন। এতকাল তো ওকে সে দেখেছে, কিন্তু প্রতিদিনই যেন ওর ভেতর থেকে নতুন কিছু বেরিয়ে আসে এবং বেরিয়ে আসে একেবারে আচমকা, কোন নোটিশপত্র না দিয়ে এমন কিছু যা ভাবতে পারা যায় না, হঠাৎ চোখে ধাঁধা লাগায়।

বুবু মনে মনে ঘাড় নাড়ে, হুঁ, ওর দাদা—ওর দাদার জন্যেই অমলের এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আর কাণ্ডকারখানা। সেখান থেকেই ওর প্রতিদিনকার এই যোগান। হায়, বেচারা বুবুর বরাতে কেবল একমাত্র দিদি সেও আবার গদ্যে কথা বলতে জানে না। আর মিলিয়ে মিলিয়ে যে সব কথা বানায়, খাতার বাইরে কোথাও তারা খাপ খায় না, নিত্যকার ব্যবহারেও লাগানো যায় না তাদের—না 'এসের' মধ্যে না 'এসের' বাইরে। সেসব কথাদের রোজকার করাই শক্ত, রোজকার কাজে লাগানো কত কঠিন আরো।

কিন্তু এই অমল! কখনো হাউই-এর মতো আকাশে উড়ছে, কখনো ফুলঝুরির মতো ভেঙে পড়ছে, কখনো বা তুবড়ির মতো কথা ছাড়ছে, প্রথমে তোমার মনে হবে আবোল-তাবোল, কিন্তু সেসব কথার মানে আছে রীতিমত। পরে তা জানা যায়, কখনো আবার বোমার মতো —যেমন এখন এইমাত্র—সশব্দে কাটছে। অমলের এই যে হকচকানো ঝকমকানো—এর জন্য ওর দাদৃভাগ্যই দায়ী। বুবুরও যদি এমনি একটা দাদা থাকত, তাহলে সেও এই রকম 'নিত্য নতুন' এবং 'চির বিস্ময়' হতে পারত, জগদীশ্বর ঈশ্বর হওয়াও তার পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব ছিল না, বুবুর মানসিক ঘাড় প্রবলভাবে নড়তে থাকে—হুঁ, এক কথায় যাকে বলা যায় গরু, তাই সে একজন হতে পারত এখন।

অমলের গরুত্বের জন্য হঠাৎ আজ ওর অন্তরে যেন হিংসা হয়। সে মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করে : হ্যাঁ, ভাবি তো! মাথার' পরে দাদা থাকলে গরু হওয়া কিছু শক্ত নয়। সবাই হতে পারে অমন গরু। দিদি হয়েই যে সব মাটি করেছে আমার।

অমল তার চিন্তাধারায় বাধা দেয়। —কি রকম শুনলি?

—গরু যে এত উঁচু জিনিস জানতাম না তো। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বুবু বলে।

অমলের গুরুত্ব ঘোষণার পর থেকে গরু সম্বন্ধে তার চিরদিনের ধারণা বদলে যায়। এতদিনের অবজ্ঞাতলোক থেকে গরু যেন অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে আজ, গরুকে নতুন করে, ভালো করে, আরো আপনার করে জানে, গরু নতুন করে শ্রদ্ধার পাত্র হয় বুবুর। গরু এবং অমলের দাদা, দুজনেই।

—জানবি কি করে? এসব জানতে হলে অনেক বই পড়তে হয়, এই রকম মোটা মোটা বই। দাদা কত পড়ে—দিন-রাত! সহসা কেমন সংশয়ের ছায়াপাত হয় অমলের মনে। —এ কবিতাটাও কি তোর দিদির লেখা নাকি?

বুবু বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে। —হবে হয়তো। এখনো তো শোনায়নি আমাকে।

—তোর দিদিকে আর এমন কবিতা লিখতে হয় না। গড় গড় করে পড়া যায়, ধড়ফড় করে বলা যায়, হাঁকডাক করে আওড়ানো যায়। এমনকি, গাওয়া, নাচা, লাফানো যায় কবিতাটা নিয়ে। তোর দিদির অমন কবিতা আছে আর?

—অনেক অনেক! বুবুর চোখে মুখে বিভীষিকা ব্যক্ত হয়। —দৌড়তে দৌড়তে চ্যাচানো যায় দিদির কবিতা।

—তবে এটাও তোর দিদিরই হবে! অগত্যা অমলকে দুঃখের সঙ্গে রায় দিতে হয়। —আমার দাদা কখ্খনো কবিতা লেখে না! দাদা ছুটোছুটির একদম এগেনষ্টে।

ব্রেকফাষ্ট-পর্ব সমাধা করে অমল নিকটবর্তী সোফায় গিয়ে সটান হয়, বুবু চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তার পাশে।

অমল হাত বাড়িয়ে রেডিয়োর চাবিটা খুলে দিতেই মুহূর্ত মধ্যে বাঙালীর ছাঁদে বিলাতের অর্কেষ্ট্রা বাজতে থাকে। যে-দুঃখের কুয়াশা বুবুর মনে জেগে উঠেছিল, কনসার্টের আলোয় আস্তে আস্তে সেটা মিলিয়ে যায়। বুবু আবার নিজেকে হাল্‌কা বোধ করে, তার অনুভব হয়, সে যেন চেয়ার ছেড়ে সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে, সুরে সুরে হাওয়ায় দুলছে যেন।

কনসার্ট থামতেই বুবু যেন আকাশ থেকে পড়ে, আবার সে চেয়ারে এসে ঠ্যাকে, কঠোর ইট কাঠের জগতে ফের যেন ফিরে আসে। মনের মধ্যে ছোট বড় নানান সমস্যা আবার তাকে বিচলিত করতে থাকে।

—আমার একটা খটকা আছে ভাই! বুবু বলে। —বিচারকেরা সব তোর দাদার মতো ওইরকম বইপড়া নয়তো, গরু সম্বন্ধে অতশত কি তারা জানে? পুরনো 'সাবজেক্ট' বলে তোর লেখাটা পাশ করতেই চাইবে না হয়তো।

—গরুর 'এসে' বলেই বরং পাশ করবে আরো। অমল জবাব দ্যায়। —দাদা বলে বিচারক মাত্রই সমালোচক আর সমালোচক মাত্রই গরু। সমালোচক আর গরু এক ক্লাসের। সুতরাং গরুর রচনা পাস না করে পারে কখনো? ফেলো-ফিলিং যাবে কোথায়।

—হুঁ, কথায় বলে ফেলো-ফিলিং! তা বটে! বুবু স্বীকার করতে বাধ্য হয়। —তোর আমার মধ্যে যেমন. —ধর যদি সমালোচক সম্বন্ধেই একটা 'এসে' লিখতিস্ গরুরা কি তা অ্যাপ্রুভ না করে থাকতে পারত?

—তবেই বোঝ! দাদা মিছে কথা বলে না।

—সত্যি! আমার দিদির যেমন চলৎ-শক্তি তোর দাদার তেমনি

—তেমনি বলৎ-শক্তি। বহুদিনের পরিপুষ্ট প্রগাঢ় সম্ভ্রম এক বাক্যে বুবু ব্যক্ত করে ফ্যালে।

রেডিয়োর ভেতর থেকে অকস্মাৎ হাঁউ-মাঁউ ধ্বনি নির্গত হতে থাকে। —বিলিতি চিড়িয়াখানা থেকে ব্রডকাষ্ট করছে বুঝি? বুবুর সাগ্রহ প্রশ্ন শোনা যায়!

—উহুঁ! কোনো সাহেব-টাহেব গান ধরেছে হয়তো।

—সাহেব? কি রাক্ষুসে গান রে বাবা! চিড়িয়াখানার নয় জেনে বুবুর উৎসাহ লোপ পায়—বন্ধ করে দে! দূর দূর! তোর 'এসে'টা না হয় পড় শুনি।

—পাশের বাড়ির ওস্তাদী গান শুনতিস যদি, তাহলে বলতিস! সে এক মারামারি ব্যাপার! মহরমের লাঠি খেলার মত। কতো কায়দা, কতো তার প্যাঁচ! রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে 'এসে'র খাতাটা নিয়ে আসে অমল। দুজনে মিলে পড়তে শুরু করে:

—গরুর একটা মাথা, মাথায় দুটো শিং, দুটো চোখ, দুটো কান, একটা গলকম্বল এবং একটা লেজ আছে।··

বুবু বিস্মিত হয়। —লেজটা কি গরুর মাথায়! জানতাম না তো!

—তা কেন? লেজ মাথার দিকে কেন হবে? লেজ হচ্ছে ল্যাজের দিকে।

—কিন্তু তুই তো লিখেছিস গরুর মাথায় এই সমস্ত!

—কেন, আমি তো দু'ভাগ করে দিয়েছি। শিং থেকে গলকম্বল পর্যন্ত মাথার দিকে, তারপরেই 'এবং' আছে যে। 'এবং' দেখলেই বুঝবি যে সে আর একটা সেন্‌টেন্‌স্। একেবারে আলাদা বাক্য।

—ওঃ! বুবু এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রচনায় মনোযোগ দ্যায়।

—কিন্তু দুঃখের বিষয়, গরুদের কোনো নাক নেই, আমাদের মতো।···

বুবু এবার তার বিস্মিত দৃষ্টি খাতা থেকে তুলে নিয়ে অমলের

নাকে স্থাপিত করে। —কি রকম? এমন সব জলজ্যান্ত নাক, আর বলছিস আমাদের নাক নেই।

অমলও কম অবাক হয় না। —নাক থাকবে না কেন? বলিস কি তুই? নিজের অজ্ঞাতসারেই নাকে সে হাত দ্যায়।

অমলের নাসিক-প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল না, কেননা তার নাকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুবুর সন্দেহ ততটা গাঢ় নয় যাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের আবশ্যক করে। সে মাথা নাড়ে। —আহা আমি কি তাই বলছি! তুই নিজেই তো বলছিস সে কথা?

বন্ধুর সম্বন্ধে মনেব হতাশা চেপে বাখা এবারে শক্ত হয় অমলের পক্ষে। —না, তুই কিছু ভাষা বুঝিস না। ঐ সেন্‌টেন্‌সের মানে হোলো আমাদের নাকেব মতো নাক গরুদেব নাই। কথাটা আমি ঘুবিয়ে বলেছি, সোজা কথা ঘুরিয়ে বলাব নামই হচ্ছে ষ্টাইল।· এসব কি আর ইস্কুলে শেখায়? দাদাব কাছে শিখতে হয় এসব।

বুবু শুধু বলে, তা বটে! মনের আক্ষেপ সে মনেই চেপে রাখে। দাদাহীনতাব দুঃখ দাদাবান্‌দেব কাছে বলে কী লাভ?

—কেন, স্পষ্ট করে দিয়েছি তো। —পরের সেন্‌টেন্‌সেই অমল অনুযোগ করে।

ববু পড়ে চলে। —কিন্তু দুঃখের বিষয় গরুদেব কোনো নাক নেই আমাদেব মতো। অনেকটা চীনেম্যানদের যেমন—নাকের জায়গায় দুটো কেবল ফুটো দেখতে পাওয়া যায়।··

অমল এখানে বাধা দ্যায়। —দাদা বলছিল চীনেম্যানদের নামটা বাদ দিতে।

—আরসোলা খায় বলে?

—গরুব সঙ্গে তুলনা করলে ওরা চটতে পারে। ওরা হোলো তো স্বাধীন জাত, গরুরা পরাধীন জাতিব মধ্যে গণ্য।

—আমি অনেক চীনেম্যান দেখেছি, কিন্তু সবাই বেশ ধপধপে। চটা চীনেম্যান কখনো দেখিনি।

—চীনেম্যান খেপলে কি হয় কে জানে।

—ওটা বাদই দে তাহলে।

রচনা-পাঠ শুরু হয়ঃ গরুর পাগুলো ভারী সরু সরু....হাতীর পায়ের মতো নয়। সেজন্য গরুরা কোনো অসুবিধা ভোগ করে কিনা জানা যায়নি। ভগবান বোধ হয় ওদের দেহে কবিতা মিলাবার জন্যই ঐরকমটা করেছেন। গরু আর সরু। যাই হোক এই পাগুলো গরুর ভ্রমণের সময়ে খুব সাহায্য করে। এবং গরুর লেজটা। যেটা তার মাথার অপর প্রান্তে, একেবারে দক্ষিণ মেরুতে, সেটা আমাদের চক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হলেও, মশা-মাছি তাড়াবার পক্ষে গরুর বিশেষ কাজে লাগে।..

দাঁড়িতে পৌঁছে বুবু হাঁপ ছাড়ে! —বাবা কতবড় একটা সেন্‌টেন্‌স্‌। কি করে লিখেছিস?

হুঁ! ওরই নামতো ষ্টাইল! অমল আত্মপ্রসাদ জাহির করে।

—গরুরা পরের উপকার করতে ভারী মজবুত! গরু মাত্রেই পরোপকারী। এমনকি গরু যখন নাম বদলে ফেলে বলদ হয় তখনো তার এই স্বভাব বদলায় না। গরুর অপর নাম হোলো বলদ। বুবু এখানে থামে। —এ লাইনটা কেটে দিয়েছিস যে?

—দাদা দিয়েছে! অমল দুঃখ জ্ঞাপন করে। —কেটে, এমন একটা শক্ত কথা বসিয়েছে—পেল্লায় এক শব্দ, আমি তার মানেই জানি না। এগজামিনাররা জানলে হয় এখন!

বুবু পড়তে থাকে। —ষাঁড়ের অপভ্রংশ বলদ। ওরা আমাদের জমি চষে দ্যায়। কিন্তু কি রকম নিঃস্বার্থপর ভেবে দ্যাখো। জমি চাষ করে বটে কিন্তু জমির মালিক তারা নয়। তা থেকে যেসব ধান ও চাল জন্মায় তারও কোনো দাবী তারা রাখে না। এমনকি, সে সব তাদের খাদ্য নয়। তারা কেবল খড় খেয়ে থাকে। কিম্বা, ধান খেলেও নিজের জমি ছেড়ে পরের জমিতে গিয়ে ধান খায়। মারও খায়। এই জন্যই মহাদেব আরো বিস্তর জানোয়ার থাকতে বলদকেই

নিজের যোগ্য বাহন বলে বেছে নিয়েছেন। প্রায় সময়েই তাঁকে বলদের উপর চেপে থাকতে দেখা যায়। মহাদেবের যে কোনো ফটোই তুমি ছাখো না কেন, দেখতে পাবে বলদ ও মহাদেব দুজনেই শশরীরে একধারে বিরাজ করছেন।··দম নিতে বুবু থামে, কিন্তু সপ্রংস উচ্ছ্বাস দমিয়ে রাখতে পারে না। —অমল এ জায়গাটা তোর ভাবী ভালো হয়েছে। সত্যি।

বুবুর গুণগ্রাহিতায় অমল মুগ্ধ হয। —আরো কত ভালো পাবি পড়ে দেখ না।

—মেডেলটা মারবি মনে হচ্ছে।

—আমারো তাই সন্দেহ। অমল মাথা নাড়তে থাকে।

—গরু আমাদের অতি পরিচিত ব্যক্তি। অতি শিশুকাল থেকে আমরা গরু দেখে আসছি। গরুকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এক যাদের সিং আছে আর এক যাদের শিং নেই। যাদের শিং নেই তাদের ছেলেবেলা থেকেই নেই, অনেকের আবার বাছুর অবস্থায় শিং থাকে না কিন্তু গরু অবস্থায শিং গজায। মানুষের মধ্যে যাদেব চোখ নেই, কান নেই, তারা যেমন দুঃখিত, শিং-হীন গরুরাও যে তেমনি দুঃখ-কাতর একথা আমি জোর কবে বলতে পারি। তাবা গরু বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না, নিজেদের সমাজে শিং নাড়তে পারে না, লজ্জায় মাথা নীচু কবে থাকে। গুঁতো খেয়ে বেড়ায় কিন্তু কাবোকে গুঁতোতে পাবে না। শুনেছি গরুব নাকি একপাটি দাঁত। এ বিষয়ে আমার নিজের কোন মতামত নেই। কেননা আমি কখনো কোনো গরুকে হাঁ কবতে, কি হাই তুলতে দেখিনি। বোধ হয মানুষ কাছে থাকলে ওরা হাই তোলে না, কিম্বা তোলা আপাতত স্থগিত রাখে, পাছে কেউ দাঁত দেখে ফ্যালে। একপাটি দাঁত একেবারে না থাকা নাকি লজ্জার বিষয়। শুনেছি আমার ঠাকুর্দার নাকি ছিল না, কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি—বাবাকেই চোখে দেখিনি তো ঠাকুর্দা। গরুরা হাঁচে কিনা জানি না, হাঁচিয়ে দেখলে হয়। একদিন এক গরুর

নাকে নস্যি দিয়ে দেখব। নস্যির ফলাফল এবং দাঁত দুই-ই একসঙ্গে পরিষ্কার হবে।·· বুবু এখানে খুব উৎসাহ বোধ করে। —হ্যাঁ হ্যাঁ দেখিস তো। কিন্তু আমি যখন থাকব, তখন।

অমল বলে, আচ্ছা।

—আমি বাবার নস্যির ডিবে সরিয়ে রাখব আজ। আর আমাদের বাড়ির পাশেই খোট্টা গোয়ালাদের খাটাল। আজ বিকেলে যখন যাবি—কেমন? উৎসাহের আতিশয্যে বুবু উছলে ওঠে।

—বেশ!

—কিন্তু আমাদের একটিপ নস্যে কি গরুর কিছু হবে? যা ওদের নাক। যে রকম প্রকাণ্ড! লম্বায় নেই বটে, কিন্তু চওড়ায় বেশ।

—গোটা ডিবেটায় চালিয়ে দেব না হয়। অমল অম্লানবদনে বলে দেয়।

—উঁহুঁ, বাবা তাহলে রাগ করবেন। একদম খোয়া গেলে কি রক্ষে আছে? একবার ডিবে হারিয়ে যেতে বাবা আমাকে ধরে নস্যিব সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

অমলের চোখ বড় হয়। —য়্যাঁ? বলিস কিরে? একেবারে গুঁড়ো করে?

—দস্যি বলে। বুবু উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত। এবার হারালে হয়তো আমাকেই নস্যি করে ফেলবেন।

—নস্যি আর দস্যি—বেশ ভাল তো? টুকে রাখতে হবে। খাতার এক কোণে পেনসিল চালায় অমল।

বুবু আবার শুরু করে—কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, গরুর পাগুলো আসলে গরুর পা নয়। ওগুলো গরুর হাত। অর্থাৎ গরুরা নাকি চতুর্ভুজ।

এবার বুবুর বিস্ময়, বুবুর বিশ্ব-ছাপিয়ে ওঠে—বলিস কি? কোন্ পণ্ডিত রে? আমাদের সেকেণ্ড পণ্ডিত বুঝি?

—আমাদের ইস্কুলের পণ্ডিত না। ইস্কুল ছাড়া কি পণ্ডিত নেই?

এ হচ্ছে ইস্কুলের বাইরের পণ্ডিত। নামজাদা পণ্ডিত একটা! একটা ডাক্তার পণ্ডিত।

সে ডাক্তারিও করে আবার?

আহা, তা কেন? ডঃ আর ডাঃ দুরকমের ডাক্তার আছে না? তার একটা।

—নামটা কী শুনি?

—নাম এখনো ঠিক করিনি। একটা বসিয়ে দিতে হবে দেখে শুনে। হুয়েন সাং কি ফাহিয়ান, লং ফেলো কি বিদ্যাসাগর—যা হয় একটা।

—সে আবার কি?

—দেখিসনি উঁচু দরের লেখার কত সব কোটেশান দেওয়া থাকে? অমুক পণ্ডিত বলেছেন, অমুক বৈজ্ঞানিকের মত এই—। দেখিসনি কখনো?

—দেখেছি, সে তো সব সত্যি কথা।

—সত্যি না ছাই! সব বানানো! অমনি দিতে হয়—না হলে 'এসে' জমকালো হয় না। অমল সজোরে নিজের মত উজাড় করে। —কোটেশান না হলে আবার 'এসে'। ষ্টাইল তো কাকে বলে জানিসই না, তাছাড়া তুই একদম কিচ্ছু জানিস না। তোকে নিয়ে যে কি করব! 'এসে' মানেই হল এই যে, তুই পরের কথা নিজের বলে চালাবি আর নিজের কথা পরের নামে চালাবি।

—তাতো জানি! বুবু আমতা আমতা করে। —কিন্তু একেবারে একজন পণ্ডিতের নামে নিজের কথাটা চালানো··। সে একটু কিন্তু কিন্তুই হয়।

—কেন আমি কি কোনো পণ্ডিতের চেয়ে কম যাই? বুবুকে একেবারে নির্বাক করে দ্যায় অমল। - শব্দরূপটা বলতে হোলো তাহলে—নরঃ নরৌ নরাঃ, নরম্ নরৌ নরাণ্। নরেণ নরাভ্যাম্—। ভ্যামের পর অকস্মাৎ থেমে যেতে হয় অমলকে, কিন্তু সে সহজেই

নিজেকে সামলে নিতে পারে। —পততি-টা বলব? পততি পতত পতন্তি, পতসি পতথঃ পতথ, পতামি—পতাব—পতাম! বলিস তো সমস্ত উপক্রমণিকাটাই আউড়ে যেতে পারি।

বুবুর সভয়ে বাধা। —'এসে'র কাজটা শেষ করি আগে।

—সেই সব পণ্ডিতদের মত এই ক্ষুর, পায়ে থাকবার জিনিস নয়। অন্য কোনো জন্তুর পায়ে ক্ষুর নেই, কুকুর কিম্বা বেড়ালের পায়ে। অমন যে হাতী, অতো যে পায়াভারী, তারও পায়ে ক্ষুর নেই! মানুষের পায়েও ক্ষুর দেখা যায় না। কিন্তু হাতেই সাধারণত ক্ষুর দেখতে পাওয়া যায়। অনেক মানুষের হাতে আমরা ক্ষুর দেখে থাকি সেই থেকে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে গরুরা কোনো কালে মানুষ ছিল এবং মানুষরা ছিল গরু।

বুবু বলে, এখানে তুই সেকেণ্ড পণ্ডিতের সেই কথাটা চালিয়ে দিতে পারতিস। নিজের নামে কি সেকেণ্ড পণ্ডিতের নামে।

—কোন কথাটা?

—সেই যে ব্যাকরণের ঘণ্টায় সেদিন বললেন। হীরু ব্যাকরণ বলতে বলে ফেলেছিল বাকরণ···

হাঁ হাঁ মনে পড়েছে। আর সেকেণ্ড পণ্ডিত বল্লেন, উহুঁ, ঈষৎ ভুল হচ্ছে বৎস। কথাটা বাকারণ নয়, হাম্বাকরণ। হীরু জিজ্ঞাসা করল হাম্বা কেন সার?

—আর উনি বল্লেন কেন বুঝতে পারছ না? আমরা তো ছেলে পড়াই না, গরুচরাই। আর গরুকে যতই চাড়া দাও সে কি কখনো ব্যা করতে পারে? তাহলে ভ্যাড়া হয়ে যাবে যে।

—তা এ-কথায় চালাবার মতো কি আছে? আমি তো ভ্যাড়ার 'এসে' লিখিনি।

—কেন, 'মানুষেরা ছিল গরু' এর পরে এইটে যোগ দেনা যে এমনও অনেক পণ্ডিতের ধারণা, যেমন আমাদের ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত, যে এখনও অধিকাংশ মানুষ গরুই রয়ে গেছে। যথা—যেমন

উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের হীরু, করতে পারে না এবং···

—আর হীরু এসে আমাকে ধরে চাঁটায়। ব্যা না করতে পারুক, বাদরামিতে সে কম কি ?

—চাঁটির ভয়ে মেডেল ছাড়বি ? সেকেণ্ড পণ্ডিতের নামে কথাটা দিলে কেমন খুশি হোতো সেকেণ্ড পণ্ডিত। সেও তো একজন এগজামিনার।

—তাহলে কি ঐ মেডেল একমিনিটের জন্যেও হীরুর হাত থেকে বাঁচাতে পারব ? ও যেরকম গুণ্ডা আর বদরাগী। তুই কি চাস যে হীরু গরুর রচনা না-লিখেই মেডেলটা পাক ?

বুবু তার মৌন অসম্মতির দ্বারাই বোঝায় যে সে তা চায় না, রচনার প্যারা সে অতঃপর শেষ করে। —অনুমান করেন যে গরুবা কোন কালে মানুষ ছিল এবং মানুষেরা ছিল হীরু···

অমল সংশোধন করে দ্যায়। —হীরু নয় গরু।

—হুঁ গরু। এই কারণেই আমি গরুদের চতুষ্পদ প্রাণী বলতে মোটেই রাজী নই। হয় তাদের চতুর্ভুজ বলো নয়তো বলো যে নিষ্পদ প্রাণী।

প্যারা শেষ হলে বুবুকে কিঞ্চিৎ ভাবান্বিত দেখা যায়। —পণ্ডিতদের কথাই আলাদা। অনেক কিছু দেখা ওঁদের অভ্যেস, আমি কিন্তু ভাই, কোনো মানুষের হাতেই কখনো ক্ষুর দেখিনি।

কিন্তু এক কথায় বুবুকে হতভম্ব করে দেয় অমল।

—কেন, নাপিতের হাতে ? আর নাপিত তো মানুষের মধ্যেই গণ্য ?

অমল বলে, সেকেণ্ড পণ্ডিতকে খুশি করে দিয়েছি একটু পরেই, পড়ে দ্যাখ না। ওঁরও একটা কোটেশান চালিয়ে দিয়েছি।

বুবুর দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়।—

—এই সব পণ্ডিতদের কথা আমাদের মানতে আপত্তি করা উচিত

নয়, যদিও এসব পণ্ডিতরা কোনদিন আমাদের মারতে আসে না বা আসবে না। তাছাড়া গরুদের সঙ্গে পণ্ডিতদের আত্মীয়তা সর্বজন-বিদিত···

দেখছিস সর্বজনবিদিত কথাটা কেমন লাগিয়ে দিয়েছি? বন্ধুর কাছ থেকে সমজদারি প্রত্যাশা করে অমল।

—এসব লম্বা লম্বা কথা লাগানো উচিত নয়, 'এসে' পড়ার উৎসাহ চলে যায়। বুবু বলে। কথাটা উচ্চারণ করতে তাকে বেগ পেতে হয়েছে।

—গরুদের সঙ্গে পণ্ডিতদের আত্মীয়তা—যাক! পণ্ডিতরা তো সব গবেষণা নিয়েই থাকেন? আর আমাদের পূজনীয় সেকেণ্ড পণ্ডিতমহাশয় বলেন যে, গবেষণা করার অর্থ হচ্ছে গরু খোঁজা। গো-এষণা—সন্ধি করলেই গবেষণা। এষণা মানে খোঁজা। পণ্ডিতরা গরু খুঁজতেই ব্যস্ত, সব সময়েই খুঁজচেন, কিন্তু খালি খুঁজতেই ওঁরা ভালোবাসেন, খুঁজে পেতে চান না। কেননা গবেষণা থেকে গো এষণা কিনা গোরু, ডু নট কাম, এও বোঝাচ্ছে। আমার মনে হয় এই যে, পণ্ডিতরা পণ্ডিতদের মোটেই দেখতে পারেন না, মতের গরমিল হলে প্রায়ই তাঁদের ঝগড়া বেধে যায়। ঝগড়া গিয়ে মারামারিতে গড়ায়, যেমন আমাদের হেডপণ্ডিত আর সেকেণ্ড পণ্ডিতের মধ্যে···

অমল বলে উঁহুঁ, ও লাইনটা কাটতে হবে, নইলে আবার এই 'এসে' নিয়েই ঝগড়া বেধে যাবে। আমার মেডেলের দফা রফা!

বুবু সংশোধন করে নেয়। —প্রায়ই তাদের ঝগড়া বেধে যায়, ইত্যাদি—বাদ। এই কারণে পণ্ডিতরা ব্যস্ত হয়ে গরু খুঁজে বেড়ান। গরুদের সঙ্গে তাঁদেব ভয়ানক মতের মিল হয়। গরুরা পণ্ডিতদের বুঝতে পারে আর পণ্ডিতরাও গরুদের বোঝেন। সেইজন্যেই আমি বলছিলাম পণ্ডিতদের আর সব কথা আমরা মানি আর নাই মানি গরুদের বিষয়ে তাঁদের সব কথা আমরা মানতে বাধ্য। কেননা গরুদের নাড়ি নোক্‌খত্র সবই ওঁদের জানা।

বুবু সন্দেহ প্রকাশ করে। —নোক্‌খত্র [illegible] বোধ হচ্ছে।

—আমিও তাই ভেবেচি। কী হবে বল্‌ তো?

—ওটা ভারি শক্ত বানান। আমার পিসেমশাই ওটা উচ্চারণের আগে দাঁত খুলে রাখতেন, কিম্বা বলতেন নক্ষত্র। অনেক টাকায় দাঁত বাঁধিয়েছিলেন কিনা। পাছে ভেঙে যায়।

—তাই তো! কী করা যায়! মুশকিল হোলো তো! অমল উৎকণ্ঠিত হয়।

বুবু বলে, নোক্‌খত্রের বদলে ভুঁড়ি বসিয়ে দে না-হয়!

অমল আকাশ থেকে পড়ে। —কোথায় নক্ষত্র আর কোথায় ভুঁড়ি!

ব্যবধান যে ঘোরতর সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নক্ষত্রচ্যুত হয়ে ভুঁড়ির ওপরে আছাড় খেতে নেহাৎ অমলের আগ্রহের অভাব দেখা যায়। কিন্তু বুবু বলে, মন্দ হবে না। তাহলে কথাটা দাঁড়াবে গরুদের নাড়িভুঁড়ি। সবই ওঁদের জানা। মানে বোঝার কিছু কি অসুবিধা হচ্ছে?

—না, তা হচ্ছে না। কিন্তু ভুঁড়ি কথাটা? কিন্তু অল্পক্ষণেই কপালের রেখা মুছে ফ্যালে অমল। থাক গে। ভুঁড়িই থাক। নাড়ি থাকলেই ভুঁড়ি থাকে!

—আমিও তাই বলছি। বুবু সায় দ্যায়।

রচনা পাঠ চলে।...গরুরা ইচ্ছ করলেই দুধ দিতে পারে, কিন্তু সাধারণত ওদের দুধ দেবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত কম। দুধ ওদের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে জোর করে আদায় করা হয়। সে এক ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির ব্যাপার, আমি অনেকবার স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু গোবর ওরা না-চাইতেই দ্যায়। সেই গোবর থেকে আমাদের ঘুঁটে হয়, যা বেচলেই পয়সা। এইভাবে গরুরা অনেক পয়সা অনায়াসেই উপার্জন করে, কিন্তু সে পয়সা তাদের নিজেদের কাজে লাগে না।

—তাদের সেই কষ্টার্জিত অর্থ—অপরেরা আত্মসাৎ করে। এটা আমার মতে, খুব অন্যায়। তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতদের কি মত হবে আমি বলতে পারি না…

বুবু বলে, গরুদের যা মত, পণ্ডিতদেরও তাই হবে।

—গরুর কোনো মতামত নেই এ ব্যাপারে। অমল জানায়।

—তা কি হতে পারে? মত একটা আছেই, প্রকাশ করে না কেবল। বুবু বলে। —গোলমাল করতে চায় না বলেই চেপে যায়।

—জানলে তো। গোবর থেকে কি গড়ে জানেই না। ঘুঁটের খবরই রাখে না ওরা।

—তাহলে আর কি হবে। বুবু পুনরায় খাতায় চক্ষুনিবেশ করে:

—গরুর দুধ খুব উপকারী, কিন্তু সুখাদ্য একেবারে নয়। দেখা গেছে উপকারী জিনিসমাত্রই একদম অখাদ্য। যেমন পড়ার বই। বাজে বই আমি দিনে তিনখানা শেষ করতে পারি কিন্তু তিন লাইন পড়া করতে আমার জ্বর আসে। কিম্বা পেট কামড়ায় কিম্বা মাথা ধরে। কিন্তু কি অবাক কাণ্ড। যে-দুধ দেখলে আমি ভয়ে পালাই কিম্বা পিছনে লং জাম্প দেবার চেষ্টা করি, আমাদের বুবু সেই দুধ যে কি করে গেলাস গেলাস গেলে আমি ভেবে পাই না। ও কি আগের জন্মে বাছুর ছিল?…

বুবু ভয়ানক প্রতিবাদ করতে থাকে। —এ লাইন এক্ষুনি তুমি কেটে দাও।

অমল বলে, তা কি হয়? একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

—না, রাখা চলবে না কিছুতেই। তাহলে তোর সঙ্গে আড়ি!

অমল বেজায় সমস্যায় পড়ে। · বাছুর তো তোর আপত্তি?

—নিশ্চয়!

—আচ্ছা, তবে বাছুরের জায়গায় ষাঁড় করে দিচ্ছি, কিন্তু ষাঁড়কে কখনো দুধ খেতে দেখিনি ভাই! বাছুরেই খায়।

—না, ষাঁড়-টাঁড় কিচ্ছু না। ও লাইনটাই বাদ।

অগত্যা ম্লান মুখে লাইনটা কেটে দেয় অমল।

—গরু দুধ দেয়, কিন্তু দুধ ছাড়া আর যা যা দেয়, তার মধ্যে খাদ্যের ভাগ খুব কম। যেমন গোবর এটসেটরা। প্রায়শ্চিত্ত করলে লোকে গোবর খায় শুনেছি। অনেক পাপ করলে তবে দুধ খাবার দুর্ভাগ্য হয়, আরো কতো বেশি পাপ করলে গোবর খেতে হয় ভগবানই জানেন। আর জানে গুবরে পোকারা। গরুর অন্যান্য দাতব্য জিনিসের মধ্যে গুঁতোটাও গণ্য। খাদ্যের মধ্যেই কিম্বা অখাদ্যের মধ্যে, যাই বলো। বড়োবাজারে চলতে গিয়ে অনেককেই গরু অথবা ষাঁড়ের গুঁতো খেতে হয়েছে বলে শুনেছি।...

আমি ছোটবেলায় নাকি ছুরির বাঁট খেতাম। অর্থাৎ কিনা খাবার চেষ্টা করতাম। ছুরির বাঁট গরুর হাড়ে তৈরি হয়। অন্যমনস্ক অবস্থায় এখনো মাঝে মাঝে মুখে পুরে দিই। সাহেবরা হাড় খায়। আমি বোধহয় আগের জন্মে সাহেব ছিলাম, যেমন বুবু ছিল...

অমল নিজেই এবার বাধা দ্যায়। —যেমন বুবু ছিল-টা বাদ দিয়ে দে।

আবার বাছুরত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়াতে বুবু এবার অন্তরে অন্তরে খুশি হয়ে ওঠে। আনন্দ সে একেবারে ব্যক্ত করে ফেলে। —সত্যি তুই সাহেব ছিলি, তোর কেমন টকটকে রঙ।

—কিন্তু এ জন্মে বাঙালী হয়েই ভালো করেছি, কি বলিস?

—নিশ্চই, নইলে তোর সঙ্গে আমার দেখাই হোতো না, বন্ধুত্বও হোতো না তাহলে।

—তাছাড়া ইংরেজিতে কথা বলা কি সোজা রে? সেই ভয়েই বিলেতে জন্মাইনি বোধহয়।

—তা বটে। একটা তিন বছরের ছেলেও দেখেছিস কিরকম ইংরাজি বলে আর আমাদের সেকেণ্ড পণ্ডিতের ইংরেজি বলতে হলেই দম আটকে আসে। সেকেণ্ড পণ্ডিতের বয়স কত? ত্রিশ হবে?

—তা অন্তত ত্রিশ বছর আগে যে ত্রিশ ছিল তা নিশ্চয়।

বুবু বলে, না এটা শেষ করে ফেলি। বেলা হচ্ছে।

—যেমন বুবু ছিল—বাদ যাক—তারপর।···শিশুরা ছেলেবেলায় খুব প্রতিভাবান হয়, বড় হলে ক্রমশ বোকা হতে থাকে। আরো বেশি বড় হলে বুড়ো বয়সে কেবল বোকামির জন্যেই তারা মারা পড়ে। এইজন্যে খবরের কাগজে শিশুমৃত্যুর হার কেবল বাড়তে দেখি। আমি একটি প্রতিভাবান শিশুর গল্প বলব ; শিশুটিকে আমি মাসিমার বাড়ি আবিষ্কার করেছিলাম, আমারই মাসতুত ভাই। ছুরির বাঁট ছাড়াও অন্যান্য গব্যপদার্থকেও খাদ্য করে তোলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা। একজোড়া জুতো আমি ব্যবহার করি না, তাকে অব্যবহার্য করে দিয়েছে আমার সেই মাসতুত ভাই। এবার থেকে মাসিমার বাড়ি যেতে হলে খালি পায়েই যেতে হবে।

—জুতো পেলে আর কিছুই চায় না ছেলেটা। যেখানে রাখো না কেন, ঠিক টের পাবে আর হামাগুড়ি দিয়ে কখন অজ্ঞাতসারে সেই জুতো আক্রমণ করবে। তারপরে সমস্ত মুখ কালো করে কিম্বা বাদামী করে চৌকির তলা কি আলমারির পেছন থেকে যখন সে বেরিয়ে আসবে তখনি তুমি বুঝতে পারবে কি ব্যাপার। কিন্তু তখন তোমার জুতোর সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—আমার সেই নতুন পাম্পসু, ভাবতে গেলে এখনো আমার কান্না আসে। দাদা সেই দিনই আমাকে কিনে দিয়েছিল। সেটা অবশ্য খেতে পারেনি, একেবারে সম্পূর্ণ খতম করতে পারেনি অবিশ্যি, কিন্তু তার বার্নিশ করা রং স্থানে স্থানে একেবারে সাদা করে দিয়েছে।···

বুবু বলে, তা ওকে তুই দোষ দিতে পারিসনে। ছেলেদের এমনিতেই খুব খিদে পায়। ছোটবেলায় আমারও খুব পেত। এখন যদিও খুব বড় হয়েছি, তবু খিদে পাওয়াটা ছাড়তে পারিনি, বদ-অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে বলতে গেলে।

—খিদে পায় পাক, তা বলে পরের জুতো খাওয়া কি ভালো? নিজের খেলেই হয়।

—তা বটে! অমলের যুক্তির সারবত্তা বুবুকে স্বীকার করতে হয়। —ওতে কেবল লোকে বলে হ্যংলা!

—না, আমিও বড় দোষ দিই না ছেলেটাকে। অমল এবার উদার হয়। তার মর্মান্তিক দুঃখও ভুলতে পারে। —যে বয়সে এ সব ছেলেরা খেতে থাকে তখন তার কী খাবে কিছুই স্থির নেই—যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা!

বুবু ঘাড় নেড়ে সায় দ্যায়। অমল বলে, আর, তাছাড়া আমার জুতোর মাথা খেয়ে দিয়েছিল বলেই মাসিমার কাছ থেকে সেই এ্যালাম ঘড়িটা পেলুম। সেই যে দোতলায় আমার বিছানার পাশেই টিপয়ে দেখেছিস।

স্মরণ-শক্তির সাহায্য নিতে বুবুকে বেশি বেগ পেতে হয় না। —দেখেছি, কিন্তু তোর মাসিমারা সবাই খড়ম পরে থাকে বুঝি?

—খড়ম কেন?

—ছেলের ভয়ে?

—তাদের জুতো সব তাকে তোলা। অমল যোগ করে। —অনেক সময় ছেলেটা লাঠি দিয়ে পেড়ে নেয়। এবার গেলে আমি মশারীর চালে তুলে রাখব। কিম্বা···

আকস্মিক চিন্তাস্রোতে অমলের বাক্যস্রোত বাধা পা· ।

—কিম্বা কি? বুবু জানতে উদ্‌গ্রীব।

—কিম্বা নিচেই রেখে দেব কোথাও, যাতে ছেলেটার নজর পড়ে। মাসিমাদের একটা ক্লক ঘড়ি আছে, কী চমৎকার! কী মিষ্টি তার আওয়াজ। সেইটার ওপরে আমার লোভ রয়েছে।

—তোকে দিয়ে দেবে?

—এমনি দ্যায় কখনো? আরেক জোড়া নতুন জুতো পরে যেতে হবে মাসিমার বাড়ি।

—কিন্তু এবার যদি ছেলেটা না-খায়।

—খাওয়াতেই হবে ওকে। চক্‌চকে জুতো দেখলেই ওর লোভ

হবে, আমি জানি। ভুলিয়ে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে জুতো আর ওকে একসঙ্গে ছেড়ে দেব। তার পরের জন্য আমার ভাবনা নেই।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন মানুষকে আত্মহারা করে, সেইরকম স্বপ্নালু মুহূর্তে মানুষ যা তা করে বসে আশ্চর্য-নয়? এমনকি নিজের ক্ষতিও—সমস্ত ক্ষতিয়ে দেখার তখন অবসর কোথায়? আনন্দের আতিশয্যে অমলও তাই করে বসল—সেই ক্লকটা পেলে এই—এই এ্যালামটা তোকে প্রেজেণ্ট করে দেব।

বুবু খুশি হয়। —খুব ভালো।

—তুই আজই নিয়ে যাস না-হয়। তোকে দিয়ে দিলুম। ক্লক তো আমি পেয়েই গেছি, কেবল জুতো কিনতে যা দেরি।

বুবু উল্লসিত হয়ে ওঠে। —এখনই নিয়ে যাব।

—এ-ঘড়িটা একটু স্বাধীনচেতা, অন্য সব এ্যালার্মের সঙ্গে মেলে না; নিজের ইচ্ছেমত যখন খুশি এ্যালার্ম দেয়, কোনো টাইমেব তোয়াক্কা করে না। কোনো রাত্রে তিনবার বাজছে, কোনো রাত্রে একবার, কখনো হয়তো খেয়ে ঘুমুতে যাচ্ছি তখন, আবার কখনো সকালে ঘুম থেকে উঠেছি, তখন আমার ঘুম ভাঙাতে শুরু করল!

—সে তো আরো ভালো! খুব মজা হয় তাতে। বুবু দারুণ উন্মাদনা বোধ করে।

—আমি তো তাই বলি। কিন্তু দাদার ভারী অপছন্দ। অমল বলে, ঘড়িটা হয়েছে দাদার দু-কানের বিষ। ভারি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাই কি না।

—তোরও?

—পাগল! ওর আওয়াজে আমার ঘুম গাঢ় হয় আরো। ঘুম হচ্ছে এমন জিনিস যে হঠাৎ ভেঙে গেলেই আরো জোরে চেপে ধরে।

—আর তোর দাদার?

—দাদা অনেক রাত জেগে লেখে, তখন সেটা মোটেই উচ্চবাচ্য করে না, রাত্রে অনেকদিন বাজেই না। ঘড়িটা সাধারণত চেঁচাতে

থাকে সকাল হলে পরে? কে জানে, আগের জন্মে মুরগি ছিল না কি!

—ভারি মুশকিল তো!

—হুঁ দাদা খুব ভোরে ওঠে, উঠেই আবার একচোট ঘুমিয়ে নেয়। তখনই ঘড়িটা চেঁচামেচি করে আপত্তি করতে শুরু করে!

—আমি ঠিক বাগাতে পারব ওকে! বুবু বেশ জোর দিয়েই বলে। —হীরুকেই জব্দ করেছিলাম সেদিন! বলে গড়গড় করে পড়তে শুরু করে দ্যায়।

—কথায় বলে মরা হাতী সওয়া লাখ। মরা গরুর দাম ক লাখ কেউ বলতে পারে না। তাতেই বোঝা যায় হাতীর চেয়ে গরু বেশি অমূল্য। আমার মতে মরা গরুর দাম জ্যান্ত গরুর চেয়ে কোন অংশে কম হওয়া উচিত নয়। গরু বাঁচলে গুঁতো, কিন্তু গরু মরলেই জুতো।

বুবু থামে। —এবং জুতো থেকে ঘড়ি ইত্যাদি কত কি!

অমল বলে, জুতো খাবার কথাটাই দিয়েছি, ঘড়ি পবার খবরটা আর 'এসে'-তে দিইনি!

—দিলে ভালো হোতো।

—উহুঁ। জেনে নিয়ে সবাই তখন আরো এক জোড়া নতুন জুতো পবে মাসিমার বাড়ি যেতে শুরু করুক আরকি; বাজারে তো জুতোর অভাব নেই।

—কিন্তু মাসিমার অভাব আছে। তোর মাসতুতো ভাইয়ের মতো মাসতুতো ভাই-ই বা কোথায় পাবে? অমন উপকারী মাসতুতো ভাই!

—আমার মাসিমার বাড়ীই যেত রে। অমল বলে, একটা ছুতো নিয়ে আর এক জোড়া জুতো নিয়ে চলে যেত।

—তাহলে ভাবনার কথা বটে। কটা ঘড়িই বা তোর মাসিমা সাপ্লাই করতে পারবে বল?

—আমার মেসোমশাইকে তাহলে ঘড়ির দোকান খুলতে হয়। সে এক হাঙ্গামা।

—গরু বাঁচলে গুঁতো, কিন্তু গরু মরলেই জুতো। জ্যান্ত গরু কেবল গুঁতো দিতেই পারে, কিন্তু জুতো দেবার সাধ্য মরা গরুর ছাড়া কারুর নেই। হাতীর বা ঘোড়ার চামড়ায় জুতো হয় না, গণ্ডারের চামড়াতেও না। এইজন্য পৃথিবীর ইতিহাসে গরুর স্থান সবার চেয়ে উঁচুতে। শাস্ত্রে আছে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। অর্থাৎ মা কিনা স্বর্গের চেয়েও বড়। মার চেয়ে বড় আর কেউ নেই। সেই মার সঙ্গে গরুব তুলনা করা হয়েছে গরুকে গোমাতা বলে। তার কারণ গরু স্বর্গে গিয়েই জুতো দান করে—তাই ভালো জুতো পায়ে দিলে স্বর্গ সুখ হয়। পায়ে জুতো দিয়ে আমরা হাতে স্বর্গ পাই।

—সমস্ত জন্তু জানোয়ারের মধ্যে কেবল গরুকেই মা বলা হয়েছে। কিন্তু হাতীকে কেউ বাবা বলে না। কি ঘোড়াকে মামা। কিম্বা উটকে পিসেমশাই। যদিও কেউ কেউ মাসতুতো ভাইকে গাধা বলে থাকে, আমিই বলতে বাধ্য হয়েছিলাম একদিন।

—এক বিষয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে গরুদের ভয়ানক মিল আছে। জুতোর দিকে নয়, গুঁতোর দিকে। পণ্ডিতরাও অনেক সময় যা-হোক মানুষকে গুঁতিয়ে দেন। পণ্ডিতদের শিং হচ্ছে তাঁর পাণ্ডিত্য, অদৃশ্য হয়ে থাকে, গুঁতো খাবার পরেই আমরা টের পাই। তাতে অসুবিধা এই, আগে থেকে সাবধান হওয়া যায় না, যেটা গরুর বেলায় হতে পারি। এইজন্যে গরু থেকে দূরে থাকা যায়, কিন্তু পণ্ডিত থেকে থেকে দূরে থাকাব প্রয়োজন অনেকে আমরা বুঝি না। কিম্বা অনেক পরে বুঝি। সতর্ক হলেই গরুর হাতে রেহাই পাবে কিন্তু তর্ক কবেও পণ্ডিতেরও হাতে নিষ্কৃতি নেই, দেখতে না-দেখতে তোমাকে পাণ্ডিত্যের শিং দিয়ে কখন তুলে ফেলে এইসা এক আছাড় মেরেছে! পণ্ডিতদের সঙ্গে গরুর কেবল এই তফাৎ, পণ্ডিতের পায়ে জুতো আছে গরুর পায়ে নেই। গুঁতোর দিকে মিল আর জুতোর দিকে গরমিল।...

বুবু জিজ্ঞাসা করে, তোর দাদা বুঝি পণ্ডিতদের ওপর চটা ?

—ইস্কুলের পণ্ডিতদের ওপব না, যারা সব মোটা মোটা বই লেখে, কটমট ভাষার যত গুরুগম্ভীর তত্ত্ব, তাদের ওপরে। কথাশিল্পীদের বইগুলো সব সরু সরু হয় কিনা।

—কথাশিল্পীরাই ভালো! বুবু সুচিন্তিত অভিমত দ্যায়। —পণ্ডিতরা কিছু না।

অমল বলে, যাবা মোটা মোটা বই লেখে তারা মানুষ খুন কবতে পারে।

—হ্যাঁ, ওদেব ওই বই দিযেই খুন করা যায়। বুবু খাতার পাতা ওল্টায়—বাবা, কত বড় 'এসে' লিখেছিস ?

—আর তো দেড় পাতা মোটে।

—নাঃ, মেডেলটা না-নিয়ে আর ছাড়লি না তুই। তব তো এখনো শেষ হযনি বলছিস ?

—আবেকটা প্যারা লিখে কেবল একটা ইংবিজি কোটেশান দিয়ে শেষ করব।

—ইংরাজি কোটেশান গরুর সম্বন্ধে ?

—হ্যাঁ, ঐ সেই কবিতাটা—টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিট্‌ল ষ্টাব, হাউ আই ওয়াণ্ডাব হোয়াট্ ইউ আব—ঐটাই শেষে বসিযে দেব!

—গরুদেব কি ষ্টাব বলে ? বুবু সন্দিগ্ধ হযে ওঠে—ওটা তো নক্ষত্রেব ব্যাপার।

মিলিয়ে দিতে পাবলেই হোলো। আমি মিলিযে বেখেছি। নক্ষত্রবা যেন আকাশেব গরু। গরুরা মরে স্বর্গে গিয়ে নক্ষত্র হয় কিন্তু দুধ দেবার বদভ্যাস তখনো তাবা ছাড়তে পারে না। ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে সেই রকম ওদের আলো হচ্ছে ওদের সেই দুধ।

বুবু ভাবার্থটা প্রণিধান করে—শেষটাও তোর বেশ হবে তাহলে, বলে বচনাব অবশেষে গিয়ে উপনীত হয়।

—গরু অনেকটা ভগবানের মতো। চর্মচক্ষে তাঁকে দেখা যায় না, মর্মচক্ষেই তার আসল রূপ ধরা পড়ে। একটা গরু দেখে তুমি মনে করছ সামান্য একজন পথের গরু, পথিক গরু একজন। কিন্তু আসলে ঐ গরুর সঙ্গে চলেছে প্রায় বিয়াল্লিশ জোড়া জুতো, বেশিও হতে পারে; হাজার খানেক ছুরির বাঁট, দুধের বাঁট বাদ দিয়েও; ঘুঁটের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না, প্রায় পাঁচ চৌবাচ্চা দুধ, মানে যতদিন বেঁচে থাকবে, তার দুধ টোটাল করে এবং চার হাতে চার জোড়া ক্ষুর—

—বুবু বলে, তাছাড়া একপাটি দাঁত।

—এবং ঐ গরুর সঙ্গে চলেছে অন্তত বিশ ত্রিশ ডজন মশা আর মাছি আর একটিমাত্র লেজ। গরু অনবরত লেজ দিয়ে তাদের তাড়াচ্ছে। তারপরে ঐ দুধ ভেঙে তুমি দই করো, ছানা করো, মাখন করো, ঘি করো কি ঘোল করো। এ সমস্তই ঐ গরুকে ভাঙিয়ে। তা থেকে যত কিছু খাদ্যাখাদ্য সমস্তই বলতে গেলে গরুর ভগ্নাবশেষ!

—সুতরাং একটা গরু যে কত ভীমনাগ আর দ্বারিক ঘোষকে বেঁধে নিয়ে চলেছে কে তার ইয়ত্তা করবে? কত ঝুড়ি ঝুড়ি সন্দেশ রসগোল্লা আর বোঁদে যে ঐ গরুমূর্তি ধারণ করে আছে কে বলবে? কত যে আবার খাবো, আমসন্দেশ তালশাঁস ··

বুবু অকস্মাৎ লাফিয়ে ওঠে। ঐ যাঃ। একদম ভুলে গেছি।

—কি? কি হয়েছে?

—দিদির কবিতা।

—তোর দিদির কবিতাও কি গরুর থেকে? অমল আশ্চর্য্য হয়—এক ধাক্কায় পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হয়ে পড়ে। —য়্যাঁ বলিস কিরে? গরুর এতদূর পরিসীমা তার কল্পনার বাইরেই ছিল।

—দিদি যে একটা কবিতা দিয়ে পাঠিয়েছে আমাকে। কলেজ ম্যাগাজিনের এডিটারকে দিতে। সেই জন্যেই সকালে বেরিয়েছি আর সেই কথাই গেছি ভুলে। কী সর্বনাশ! বুবু কাঁচুমাচু হয়।

—তোর তালশাঁসের কথায় মনে পড়লো। বুবু শার্টের পকেট থেকে কবিতাটাকে টানাটানি করে আনে। —ভাগ্যিস! নইলে দিদি খেয়ে ফেলত।

কাগজখানা হাতে নিয়ে অমল নাড়াচাড়া করে। —এ কি কাগজ রে? নেড়ে চেড়ে নাকে শুঁকে দ্যাখে। —বাঃ বেশ গন্ধ তো?

—দামী প্যাড না-হলে দিদির কবিতা বের হয় না। বুবু যোগ করে। —তোর দাদা কিসে লেখে রে? কোম্পানীর কাগজে নয় তো?

—দাদা? লম্বা লম্বা ফুলস্কেপে। বলে ফুলস্কেপ নাহলে ফুল স্কোপ পাওয়া যায় না লেখার। কবিতাটি পড়ে অমল ঘাড় নাড়তে থাকে। —দাদা মিথ্যে বলে না।

—কি, ভালো হয়নি পদ্যটা?

—বীণাদির কবিতা সত্যি সত্যি খুব ভালো। অমল মন্তব্য করে। —আমি এর আগে তো কখনো পড়ে দেখিনি। দাদা কিন্তু অনেক পড়ে।

—তোর দাদার তো ভালো লাগে না দিদির কবিতা, তবে পড়ে কেন?

অমল অপ্রস্তুত হয়। —আমিও তো তাই ভাবি। বো' হয় ভুলে পড়ে ফ্যালে!

—এই কবিতাটা তো লাগিয়ে দিলে হয় আমার 'এসে'য়? বুবুর মতামতের অপেক্ষা রাখে অমল। —বেশ চমৎকার হয়, নারে?

—তুই তো টুইংকেল লাগাবি?

—দূর! বীণাদির কাছে কি সে কবিতা লাগে? তাছাড়া এটা বেশ লাগসইও হবে। আমি এটা কপি করে নেব কেমন?

বুবু বলে, আচ্ছা, এবং সে একটু বিস্মিত হয়। মেডেল-প্রাপ্য রচনার একসঙ্গে যাবার, মর্যাদা পাবার যোগ্যতা তার দিদির কবিতায় আছে, এ সে কোনদিনই কল্পনা করতে পারেনি। দিদির পদ্য সম্বন্ধে

তার মনোভাব অমলের দাদার মতোই প্রায়। কেবল তফাৎ এই অমলের দাদা ভুলে পড়ে ফ্যালেন আর বুবুকে পড়ে ভুলতে হয়।

—দাঁড়া, দাদাকে দেখিয়ে আনি। অমল উঠে পড়ে।

বুবুর বাক্য নিস্পত্তির আগেই সে অন্তর্হিত হয়। বুবু ভাবতে থাকে, কী সর্বনাশ। একেই অমলের দাদা কথাশিল্পী মানুষ, একেবারে আলাদা লাইনেব, কবিতার বিন্দুবিসর্গও তার বোঝার কথা নয়, তার ওপরে দিদির কবিতার ওপর তেলে-বেগুনে চটা। খেপে গিয়ে যদি ছিঁড়ে ছায় তাহলে কবিতার দফা তো এইখানেই রফা, দিদির সঙ্গে কোথায় গিয়ে রফা হয় কে জানে। এডিটারকে দিয়ে আসতে পারলে দিদির কাছ থেকে চকোলেট পাবার ভরসা ছিল। এক ধাক্কায় কবিতা, বুবু এবং চকোলেট এতজনেব এতখানি সর্বনাশের কথা সে ভাবতেও পারে না।

অমল মনে মনে আঁচে কবিতার লেখক বলে দাদার কাছে নিজেকেই সে জাহির করবে। পদ্য লেখকদের ওপর কেমন একটা পক্ষপাত দাদার আজকাল দেখা যাচ্ছে যেন, সেটা অমল কিছুতেই বরখাস্ত করতে পারে না। তার দাদার ওপরে তারই একচেটে অধিকার থাকা উচিত, তার মধ্যে বাইরের কোনো অনধিকার প্রবেশ একেবারেই অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু তার এই দখলদারি ক্রমশ যেন যেতে বসেছে। শনৈঃ শনৈঃ শিথিল হয়ে আসছে যেন বিশেষ করে যেদিন থেকে বীণাদির কবিতা কাগজে বেরুতে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে, অমলের এক এক সময়ে সন্দেহ হয়, নিজের কথাশিল্পের চেয়েও বীণাদির পদ্যই যেন দাদার বেশি পছন্দ। আর প্রায় রোজই তো তাকে বীণাদির সম্বন্ধে দাদার কাছে জবাবদিহি করতে হয়: কী হোলো বীণাদির ফটোটার? বলেছিলি বুবুর দিদিকে সেই কথাটা? আর সে কথাও কি ছাই সোজা কথা? 'বাংলা-সাহিত্যের সিংহ ব্যাঘ্রের আর্তনাদ' মুখস্থ করে মনে রেখে বীণাদিকে যথাসময়ে জানানো অমলের সাধ্যের বাইরে। আর্তনাদ করা তার

মতে সয় না। বিশেষত, এহেন মর্মন্তুদ—এরকম মর্মভেদী আর্তনাদ—যার মর্মভেদ করাই দুষ্কর। তাছাড়া ছোটোখাটো আর্তনাদ হলেও না-হয় দেখা যেত, এক পাতা জোড়া আর্তনাদ মাত্র একটা সেন্‌টেন্‌সের মধ্যে জানানো—তার ভেতরে কমা, সেমিকোলন, ফুলষ্টপ, নট কিচ্ছু। দাদার কাছে রিহার্সাল দেবার সময় সে মাথা ঘামায়, সিম্পল, কম্পাউণ্ড, কমপ্লেকম্—কিসের মধ্যে পড়ে সেন্‌টেন্‌শটা? হেড মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করে জানলে হয়—কিন্তু তিনিই কি বলতে পারবেন? গ্রামারের মধ্যে এরকম বাক্য থাকলে তো? সিম্পলও না, কম্পাউণ্ড না, কমপ্লেক্সও না—খুব সম্ভব, সেদিন সে দাদার ইংরিজি খবর কাগজের মাথায় বড় বড় অক্ষরে যা দেখেছিল—এ হচ্ছে তাই। এ হচ্ছে সেই ডেথ সেন্‌টেন্‌স্।

কবিতা লিখতে পারে বলেই তো বীণাদির খাতির?. বেশ, অমলও কবিতা লিখতে পারে। এই কবিতাটা পড়লে দাদাকে স্বীকার করতে হবে বীণাদির চেয়ে কোন অংশেই কম যায় না। কোনদিক থেকেই খাটো নয় অমল। সিঁড়ি দিয়ে তীর বেগে নামতে নামতে চক্ষের পলকে কবিতাটা একবার সে ঝালিয়ে নেয়। সত্যি, ভারি সুন্দর হয়েছে এই পদ্যটা। পড়তে পড়তে জিভে জল জমে ওঠে। এমন না-হলে কবিতা। তার পাঠ্য বইয়ে এমন চমৎকার কবিতা একটাও নেই।

কবিতাটি পড়ে দাদার অবস্থাটা কেমন হবে অমল আন্দাজ করে। হয়তো দাদা খুশি হয়ে হঠাৎ দশ টাকা দিয়ে বসতে পারে; বলতে পারে, অমল, যা তুই হগসাহেবের বাজার থেকে যা খুশি কেনগে। সে তাহলে এক্ষুনি খানদশেক এ্যাডভেঞ্চারের বই কিনে আনে। কিম্বা বুবু আর ও মিলে বসে আইশক্রিম খায় দুজনে। দশ টাকার আইসক্রিম—কলিটি কি ম্যাগ্‌নোলিয়ায় বসে! দশ টাকা খুব কম নয়তো! আর এ যা কবিতা দশ টাকাই এর দাম—এ পড়ে দাদা খুশি না-হয়ে যায় না।

ফাউন্টেন পেনের একপ্রান্ত চর্বন করলে অন্য প্রান্ত থেকে লেখার নিঃসরণ একান্ত হয় কিনা, অমলের কথাশিল্পী দাদা বোধহয় সেই পরীক্ষাই একাগ্র মনে তখন করছিলেন, অকস্মাৎ দুপদাপ পদ-শব্দে মনোযোগের ব্যতয় ঘটে। তিনি অমলের আবির্ভাব টের পান।

—দাদা, একটা পদ্য লিখেছি, শুনবে? অমল হাঁফাতে থাকে।

—পদ্য? দাদার চোখ কপালে ওঠে।

দাদার বিস্ময় দেখে অমলের মন আনন্দে মুখর হয়। হুঁ, এখনো তো লেখাটা শোনাই নি—তাইতেই! শুনলে তখন জিভ দিয়ে জল পড়বে। এ কবিতায় জিভ দিয়ে জল পড়তে বাধ্য।

—পদ্য কিংবা কবিতা! অমল নিজেকে সংশোধন করে। —ও একই কথা। সেই বীণাদি যা লেখে তাই। ছড়াও বলতে পারা যায়।

—বলিস কি, কবিতা লিখেছিস! তুই নিজে, না বই থেকে?

—আমি নিজে! কেন, আমি কি লিখতে পারি না? কবিতা লেখা এমন শক্ত কি! দিদিমা তো কতো মুখেই বানিয়ে দ্যায়।

—দিদিমার তো ছড়া। সে কি আর কবিতা। দাদা হাসতে থাকে।

—নিশ্চয়। অমল দিদিমার পক্ষ সমর্থন করে। —ওই গুলোই পড়ার বইয়ে দিলেই হবে পদ্য, আর মাসিকপত্রে বসিয়ে দিলেই কবিতা।

—তাই বল যে মামার বাড়ির আমদানী। অমলের দাদা আশ্বস্ত হয়—এর মধ্যে কখন গেলি বালিগঞ্জ?

—বালিগঞ্জ যাবো কেন? মামার বাড়িও যাইনি। মাসির বাড়িও না, এইখেনে বসেই আজ সকালে তৈরী করেছি, নিজে হাতেই বানিয়েছি।

—বটে? কই দেখি? দাদা হাত বাড়ায়।

—দাঁড়াও, আমি পড়ছি। কবিতাটাকে দাদার হাত থেকে সে বাঁচিয়ে নেয়। বীণাদির হস্তাক্ষর অমলের নিজের বলে সন্দেহ করা দাদার পক্ষে হয়তো কঠিন হতে পারে—আজ সকালেই লিখলুম।

আমার সেই 'এসে'টার শেষে লাগাবার জন্যেই লিখতে হোলো। কি করবো ?

মনে মনে বলে, হুম, হাঁ-খানা যা করেছে তা একরকম কবিতাকে অভ্যর্থনা করবার মতোই বটে। দাদার বদন-ব্যাদন অমলকে পুলকিত করে। হ্যাঁ, এখন থেকে অমল কবিতা লিখবে—কবিতাই লিখবে। রীতিমতই লিখবে। লেখা এমন কিছু কঠিনও নয়, বুবুর সহায়তা, আর বসে বসে নকল কবার ধৈর্য থাকলেই হোলো। হ্যাঁ, এখন থেকে অমল নিজের কবিতা দিয়েই দাদাকে ঘিরে বাখবে—সমাচ্ছন্ন কবে রাখবে ; অন্য কাবো কবিতাব কি অন্য কোনো কবির কিম্বা কবিনীর অনধিকার প্রবেশ অতঃপব সেখানে নিষিদ্ধ। এখন থেকে কবিও হতে হবে ওকে—কষ্ট করেও। নিজের দখল তো তাব হয়েছেই, বীণাদির স্থানও তাকে পূরণ করতে হবে।

অমল সুর করে পড়তে সুরু কবে—

তালশাঁস জিবেগজা আর গোলাপজাম
খেতে কি আবাম
ছানাবড়া পানতুয়া আব দানাদাব
নানারূপ মিহিদানা—
আহা কি বাহাব !

দাদা বাধা দ্যায়। —দাঁড়া দাঁড়া ! কী সর্বনাশ ! এ যে সব মিলে গেছে।

—মিলবেই তো। অমল অভিজ্ঞেব মত উত্তর দ্যায়। —কবিতায় ওবকম মিলে যায়। কত মেলে !

—কী ভয়ানক ! কাল বাত্রে কি খেয়েছিলি ?

—কী আবার খাবো ? অমল আকাশ থেকে পড়ে।

—আমার সঙ্গে বসে যা খেয়েছিলি, তাছাড়া বাইরে কিছু ? বুবুর বাড়ি কিম্বা রাস্তায় রেস্তোরাঁয় কিনে টিনে ?

—কই কিছুই খাইনি তো।

—গুরুপাক কোনো খাদ্য? ভালো করে মনে করে ছাখ।

—খেলে তো মনে থাকে। অমল অত জেরা সইতে পারে না।

—তাকি হয়? এমন কিছু খেয়েছ যা খেয়ে গরহজম হয়েছে। তা নইলে কি কবিতা বেরয়? কবিতা হচ্ছে চোঁয়া ঢেঁকুর। বদহজম থেকেই ওর উৎপত্তি। কই হাত দেখি।

অমল অপ্রসন্ন মুখে হাত বাড়িয়ে ছায়। দাদা নাড়ি টিপে ছাখে। —পেটের গোলমাল না-হলে কি কথায় মিলযোগ করতে পারে? সুস্থ লোকের কম্ম নয়। নাড়ি টিপে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, দেখি কপালটা।

—গা তো আমার গরম হয়নি। আত্মরক্ষার চেষ্টা করে অমল. কিন্তু বৃথা চেষ্টা, তাকে মাথা বাড়িয়ে দিতে হয়

অমলের দাদা কপালে করাঘাত করেন—অমলের কপালে। —পৈটিক গোলমাল থেকেই যত পোয়েটিক গোলমাল। জিভ দেখি।

জিভকে বিকশিত করতে বাধ্য হয় অমল।

—হুঁ, ঠিক ধরেছি। দাদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে থাকেন।

—তাইতো বলি। যাও, ও-ঘরের দেরাজ থেকে ক্যাষ্টর অয়েলের শিশিটা নিয়ে এসো গে। দেরাজের চাবিটা ড্রয়ার থেকে দাদা বার করেন।

অমল কিন্তু নড়ে না।

দাদা ঘাড় নাড়েন। —ওই ক্যাষ্টর ওয়েলই সারাদিন খাবে, আজ আর অন্য কিছু খাওয়া-দাওয়া নেই। বিলকুল নিল।

হঠাৎ এই নিল ডাউন হাওয়াটা অমলের ভালো লাগে না।

—বা রে, আমার খিদে পাবে যে। নিরুপায় হয়ে অমল স্বীকার করে। —ও পদ্য আমার লেখা না। বীণাদি লিখেছে।

—আবার মিছে কথা এর ওপরে! খাদ্য-লোভী ভাইয়ের ব্যর্থ প্রয়াস দেখে দাদা হাসেন। —নিজের লেখা পরের নামে চালানো —বটে।

—তুমি বুবুকে জিগ্যেস করো না! ওপরে তো আছে, ডাকবো? অমল লাফিয়ে ওঠে। এবং উর্দ্ধ লম্ফকে সম্বরণ না-করে তারই সাহায্যে এক মুহূর্তে সেখান থেকে নিজেকে দূরীভূত করে ফ্যালে।

বুবু ইতিমধ্যে অমলের রচনাটা প্রায় সমাধা করে শেষ প্যারায় এসে পৌঁছেছিল।

অমল ঝড়ের মত প্রবেশ করে। — সবনাশ হয়েছে!

—সে কি? বুবুর হাত থেকে খাতার অধঃপতন ঘটে।

—দাদা খেপে গেছে। ভয়ানক ভীষণ খেপেছে।

—কেন, কি হোলো? বুবু ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

—কি সর্বনেশে কবিতা লেখে তোর দিদি। পড়লেই মানুষের মেজাজ বিগড়ে যায়। আমারই তো মাথা গরম হয়ে উঠেছে। কিকরব ভেবে পাচ্ছিনে।

—ছিঁড়ে ফেলে দে। বুবু বলে, ছিঁড়ে ফেলাই ভালো।

—দূর, কবিতা কি হবে! কোথায় পালাব তাই ভাবছি।

—কেন, পালাতে হবে কেন? এবার বুবুর আশঙ্কা ব্যগ্রতাকে ছাপিয়ে ওঠে।

—দাদা ক্যাষ্টর অয়েলের বোতল নিয়ে আসছে যে। অমল বলে, কেউ কবিতা পড়লেই তাকে ক্যাষ্টর অয়েল খাইয়ে ছাড়ে। কি করি এখন।

বুবু একটা উপায় বাতলায়। —চৌকির তলায় লুকিয়ে থাকলে হয় না? আমি বলে দেব, অমল নেই

—আমাকে না-পেলে তোকেই ধরে খাইয়ে দেবে তখন।

—কেন, আমাকে কেন? আমি তো কবিতা পড়িনি!

—তোর দিদিরই কবিতা তো।

বুবু দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। —বলিস কিরে?

—ঐ রকম রাগলে দাদার জ্ঞানগম্যি থাকে না।

—তবে চল, এক ছুটে বেরিয়ে পড়ি। ফুটপাথে নেমে দুজনে

হাঁপ ছাড়ে। বুবু বলে, ততক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা যাক। কাউকে না-পেলে তোর দাদা নিজেই তখন খেতে আরম্ভ করবে। বোতল ফুরালে তখন আমরা বাড়ি ফিরব।

রাস্তায় যেতে যেতে অমল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। —চল্ পালিয়ে যাই কোথাও। যেদিকে দুচোখ যায়।

—কোথায় যাবি? বুবু জিজ্ঞাসা করে।

—হনলুলু কি হংকং, বনহুগলি কি বনগাঁ! মানে যেটা খুব দূরে।

—হংকং থেকে ধরতে গেলে বনগাঁটাই অবশ্যি দূরে পড়ে। বুবু বলে, অথচ যেতেও বেশিক্ষণ লাগে না। আমার পিসেমশাই বনগাঁর ষ্টেশন মাস্টার! যাবি সেখানে?

—যাবই তো। অমল জোর দিয়ে জবাব দ্যায়। —আমার কিছু ভালো লাগছে না। সত্যি!

—তবে যাই চল। বুবু উৎসুক হয়ে ওঠে। অমলের সঙ্গে বেলে চেপে কোথাও বেড়াতে গেলে বেশ হয়, এই সম্ভাবনাটা যেন সে অনেকদিন অনেকবার ভেবে রেখেছিল, এইরকম তোর মনে হতে থাকে। গাড়ির একটা কামরায় কেবল সে আর অমল, আর কেউ নেই—আর তাদের চোখের সামনে দিয়ে মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে—হুবহু বায়স্কোপ দেখার মতনই মজার হবে অমল যদি তার সঙ্গে থাকে।

—এখুনি যাবি তো? বুবু আর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। য়্যাঁ?

—এখুনিই তো। অমল ফোঁস করে ওঠে। —যে দাদার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি, সেই কিনা আমাকে ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াতে আসে! নাঃ, বেঁচে আর সুখ নেই!···

—বাস্তবিক! বুবু সহানুভূতি জানায়।

—এরকম খারাপ দাদা আর আছে নাকি পৃথিবীতে? এরকম ফেথলেশ?

—খারাপ বলে খারাপ! বুবু আরো জোরালো হয়।

অমলের মনে বৈরাগ্য তখন ঘন হয়ে এসেছে। —নাঃ, আমি আর বাড়িতে ফিরছি না। এ-জন্মে না।

বাড়ি একেবারে না-ফেরাটা বুবুর যেন বাড়াবাড়ি মনে হয়। সে বলে, বেশ কিছুদিন পরে ফিরলেই হবে। এই ধর, সামনের ভ্যাকেশনটা কাটিয়ে···

—পাগল! আবার বাড়ি ফিরব? তাহলে দাদার গুমর কি রকম বেড়ে যাবে তা ভেবেচিস? সাতদিনের মধ্যে তো নয়ই···সেই মুহূর্তেই নিজেকে সে বিশুদ্ধ করে নেয়। মানে—জীবন থাকতে নয়।

—তবে, বনগাঁতেই চল। সেখানে গেলে তোর আর ফিরতে ইচ্ছে হবে না। পিসেমশাই যা খাওয়ায়···

আপাদমস্তক উৎসাহিত হয়ে ওঠে বুবু।

—বনগাঁ যখন, তখন বাঘ আছে নিশ্চয়ই? অমল প্রশ্ন করে। বনেই তো বাঘরা থাকে সাধারণত?

—থাকা সম্ভব। বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে বুবু।

—সুন্দরবনে তো আছে। অমল বলে, তবে খাঁচাতেও থাকে এক একসময়ে। বাঘেদের কথা কিছুই বলা যায় না।

—তা থাকলো তো কি?

—আমি বাঘের পেটেই যাবো। অমল বলে হ্যাঁ—নিশ্চয়ই।

বুবু চমকে ওঠে। —বাঘের পেটে কেন? সেখানে কেউ যায় নাকি আবার?

—হ্যাঁ, যাবই আমি। আমার আর বেঁচে সুখ নেই। অমল নিজেকে প্রাঞ্জল করে। দাদার দুর্ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে আত্মরক্ষার সংকল্প ও বিসর্জন দিয়েছে। নিজেকে বিদূরিত করতে চায়। দাদার কাছ থেকে একেবারে সুদূর পরাহত হতে চায় ও।

অতদূর পর্যন্ত অমলের সহযাত্রী হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা বুবু মনে মনে ভাবে। বন্ধুর জন্য স্বার্থত্যাগের অনেক বড় বড় কাহিনী

বইয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু বাঘের পেটকে গন্তব্যস্থানের মধ্যে গণ্য করা ওর পক্ষে একটু শক্তই হয়। সে ইতস্তত করে। —কিন্তু আমি বলি কি···

অমল ওর দিকে তাকায়।

—তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না। আয় আমরা অদল বদল করি। আমি না-হয় তোর দাদার কাছে থাকি আর তুই আমার দিদির···

—তাকি হয়? তুই যে বলিস তোর দিদি ভারি ভয়ানক?

—তোর দাদার মতো অতো নয়। তোকে কোনদিন ক্যাষ্টব অয়েল খেতে বলবে না সে আমি জোর করেই বলতে পারি।

—কিন্তু কবিতা শুনতে হবে তো? সে যে আরো খারাপ। ক্যাষ্টর অয়েলের চেয়েও!

—তাহলে আরো ভালো শোনা যায়। আমি বেশ পরীক্ষা করে দেখেছি। দাদার বকুনির সময় আমি তাইতো করি। তাতে করে দাদার চোস্ত চোস্ত সব গাল বেশ ছাকা হয়ে একেবারে সারাংশ বেরিয়ে আসে। আমি সেইগুলো আবার রচনায় বসিয়ে দিই। তাছাড়া···। অমল চুপ করে।

বুবু উৎকর্ণ হয়।

—তাছাড়া আমার দাদা আমার জায়গায় আমাকে না-দেখতে পেয়ে যদি অন্য কাউকে পায় তাহলে খেপে গিয়ে তক্ষুনি খুনোখুনি করে বসবে। অমল মুখ ভার করে। —আমার শূন্যস্থান পূর্ণ করা আর কারো সাধ্য নয়।

—ভারি খারাপ তো, বুবু বলে।

—হুঁ। খারাপ তো বটেই। এমন দাদাকে কি আর কাউকে দেয়া যায়? তুই কি বলিস?

—তবে বনগাঁয়েই চল। পিসীমার গান শুনবি!

—গান? পা থেকে পিলে পর্যন্ত চমকে যায় অমলের।

—কেন, কি হয়েছে? হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করে যে পিসীমা। রোজই করে।

—তবে আর বনগাঁয়ে যাওয়া হোলো না আমার। বাঘের পেটেও না। গান যে আরো মারাত্মক। কবিতার চেয়েও! ইস!

—কেন খারাপ হোলো কিসে? বুবু একটু আশ্চর্যই হয়। —জয়গান তো নয়, শুধু হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান।

—কেবল কবিতা কেন, নাচের চেয়েও গান হচ্ছে ভীষণ। দাদা কি কলে জানিস? বলে, চোখের পাতা বুজলেই খুব বড় নাচিয়েকেও আমরা অনায়াসে সহ্য করতে পারি, অনায়াসেই আর অকুতোভয়েই বরদাস্ত করা যায়। কিন্তু গাইয়েকে? কানের পাতা বোজানোর যে কোনো পন্থাই রাখেননি ভগবান। কালারাই কেবল পেরে ওঠে ওদের সঙ্গে।

—তা বটে।

—নাচগানের ওপব ভারি চটা দাদা, কথাশিল্পী কিনা! অমল বলে।

—কথাশিল্পীরা বুঝি নিজেব কথা ছাড়া সইতে পারে না? বুবু জানতে চায়। —আর সবার কথাতেই ওদের বুঝি খুব চটে থাকতে হয়।

—তা বই কি! অমর সায় দ্যায়। —তা নইলে কিসের কথাশিল্পী।

—তাহলে তো ভারি···

এমন সময় দিগ্বিদিক থেকে বিরাট একটা হই-হই, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত ছুটে আসে—বুবুর মুখের কথা বুদবুদের মতই মিলিয়ে যায় তার গর্ভে। অমল একবার বুবুর ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে পিছনে তাকিয়ে দ্যাখে, তার পরেই চক্ষের নিমিষে বন্ধুকে বগলদাবা করে পাশের অট্টালিকার রোয়াকে গিয়ে লাফিয়ে পড়ে। এক অতিকায় ষাঁড়—অমলের দাদার ভাষায় সিংহনাদ করতে করতে সবেগে

ধাবমান আর তাকে তাড়িয়ে হল্লা করে ছুটেছে একদল লোক। লোকজনের সংশ্রবে রুচি নেই, মাখামাখি করতে নারাজ। ষাঁড় না-হয় সংসার ত্যাগ করেই চলেছে, অমলদের মতোই পৃথিবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধা না-হয়, কিন্তু এতগুলো লোক একসঙ্গে বৈরাগ্যপ্রস্ত ও বেচারার ওপর কেন এরকম খেপে গেল, তা কিছুতেই ওদের বোধগম্য হয় না।

—বাঘের পেটে যেতে তোর আপত্তি ছিল, এখন তো ষাঁড়ের শিং-এ যেতে বসেছিলি! অমল বলে।

—খুব বাঁচিয়েছিস। বুবু শুধু বলে। তার সর্বান্তঃকরণ ধন্যবাদে ভরে ওঠে, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কৃতজ্ঞতার ভাষা সে হাতে পায় না।

—দাদা বলে ঘোড়া থেকে একশ হাত দূরে থাকতে হয়, শত হস্তেন বাজীনাং, আর হাতী থেকে হাজার হাত—

—কেন হাতী থেকে এত বেশি কেন?

—কামড়ে দিতে পারে, সেইজন্য বোধ হয় সব জানোয়ারের থেকে হাতীর দাঁত সবচেয়ে বড়, কিনা। কথায় বলে গজদন্ত! শুনেছি, কিন্তু কখনো চোখে দেখিনি।

—আজই দেখতে পাবি। আমার পিসেমশায়ের আছে।

প্রাণরক্ষার বিনিময়ে জীবন সার্থক করার এই সামান্য সুযোগও সে বন্ধুর সামনে যে উপস্থিত করতে পেরেছে এইটুকু ভেবেই বুবু পুলকিত হয়।

—আচ্ছা, দেখবখন। কিন্তু হাতীর নিজের গজদন্তের মতো কি আর হবে। এ বিষয়ে অমলের সন্দেহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে যেন থেকেই যায়, কিন্তু আপাতত সে-কথা সে চাপা দ্যায়। —আর দাদা বলে, স্থান ত্যাগেন দুর্জনায়! আরসোলা, নেংটি ইঁদুর, মেনি বেড়াল, পাগলা কুকুর-এরা সব দুর্জনের মধ্যে। এদের উপদ্রব আরম্ভ হলে বাড়ি ছেড়ে, চাই কি, পাড়া ছেড়েই পিটটান দেবে। আরসোলাকেই

দাদার সবচেয়ে বেশি ভয়। এমন ফরফরিয়ে উড়তে থাকে, কথাশিল্প তখন দাদার মাথায় উঠে যায়।

—আমারো। দিদি তো কবিতার খাতা-টাতা ছুঁড়ে ফেলে খাটের তলায় সেঁধিয়ে পড়ে।

—তুই তাহলে তো গোটাকতক আরসোলা পুষলেই পারিস। দিদির হাত থেকে বেঁচে যাস্ তাহলে। আমি বোতলে পুরে এনে দোব তোকে! দিদি যদি বরাবরের জন্য খাটের তলায় থেকে যায়, তোর কি কোন আপত্তি আছে।

—কিছু না। ভাই ফোঁটার দিনটা কেবল বাদ। বুবু বলে।

—আচ্ছা, ষাঁড় থেকে কতদূরে থাকতে হবে কিছু বলে না তোর দাদা?

—নিশ্চয় বলে, কিন্তু মনে পড়ছে না এখন: তা দুশো আড়াইশ হাত, তার কম কি?

—আর গাধার থেকে?

--দাদা বলে গাধার থেকে দূরে থাকা যায় না। তাহলে সমাজ ছেড়েই চলে যেতে হয়। তবে বেশি ঘেঁষাঘেষি, মেশামেশি না-করলেই হোলো।

—এই কথাটা তোর গরুর রচনায় লাগিয়ে দিস, গরু গাধা তো প্রায় এক গোত্র। গরু বললে আমার যেমন রাগ হয়, কেউ যদি আমাকে গাধা বলে....

আবার সেই বিশ্বগ্রাসী হট্টগোল। এবার ষাঁড়টাই লোকগুলোকে তাড়িয়ে আনছে। সংসারের ওপর অনুরাগ ফিরলে এমনই হয়। অহিংস অসহযোগ থেকে একেবারে সহিংস সহযোগিতা!

অমল ভীত হয়ে ওঠে। —এইবারেই সর্বনাশ। ষাঁড়ের তাড়ায় বাঁচন আছে কিন্তু মানুষের তাড়ায় নেই। এই রোয়াকে খালি পেলেই সবাই এখানে এসে উঠবে, তাহলেই আমরা চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবো।

বুবুও সশঙ্কিত হয়। —যা বলেছিস!

অমল বলে, আয়, এক কাজ করি। পাশের ঘরের এই জানালাটা টপকে আয় আমরা বাড়িব মধ্যে ঢুকে পড়ি···

—পরের বাড়ি···। বুবু আপত্তির সুর তোলে। —বড়লোকের বাড়ি, দেখছিস না ?

—তাতে কি হয়েছে ? আমরা তো বাড়ির মধ্যে থাকছি না। আবার এই পথে বেরিয়ে এলেই হবে। প্রাণে তো বাঁচি এখন !

বলতে বলতে যণ্ড-তাড়িত সেই বিবাট জনতা ঝড়ের বেগে এসে পড়ে। এবং অমলের আশঙ্কাই ঠিক। সেই উঁচু রোয়াকেই তারা—কিন্তু তার আগেই অমল আর বুবু প্রাসাদোপম বহস্যের অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছে।

বাস্তবিক, ঘরের মধ্যে ঢোকার পর মুহূর্তেই অমল আর বুবুকে নিশ্চিত হয়ে যেতে দেখা যায়। এমনটা কি সম্ভব, সেই ঘরেই কোথাও লুকানো কোনো প্যাঁচ ছিল, যে কেউ একটা সুইচ টিপে দিতেই, দেয়াল তখনই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওদের গ্রাস করে ফেলেচে আর চোর কুঠরীর মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ে ওরা এতক্ষণ হাঁচোড় পাঁচোড় করছে কিম্বা ঘরের মেঝেই হয়তো অকস্মাৎ বদন-ব্যাদন করে পাতাল-পুরীর অন্দরে ওদের টেনে নিয়েছে—যার গর্ভ থেকে, যে গহ্বরের খপরি থেকে, উদ্ধারের উপায় অত্যন্ত সহজ ; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সুদূরপরাহত ? অথবা এমনও হতে পারে যে জাম্বুবানের মতো অতিকায় দুই জানোয়ার, ওদের দুদিক থেকে উইদাউট এনি নোটিশ, এসে— ? কিম্বা মঙ্গলগ্রহেই ওরা উধাও হয়ে গেল কিনা কে জানে। এমন অনেক কিছু হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নিতান্তই যা হয়েছিল তা এই, অমল আর বুবু যেমন-না সেই ঘর পেরিয়ে ও-ধারের বারান্দার দিকে পা বাড়াবে, ওদিকে তিনজন লোকের প্রাদুর্ভাব দেখল। তৎক্ষণাৎ তারা ফিরে এসে সেই ঘরেরই একটা দেরাজের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছে, আর কিছু নয়।

লোক তিনটে সেই ঘরেই আসে। দু'জন বাঙালী, গুণ্ডাগোছের চেহারা, তবে স্ব-শ্রেণীর মধ্যে ওদের যে কিছু আভিজাত্য আছে প্রথম দর্শনেই সেটা পরিষ্কার হয়। তৃতীয়টি মারোয়াড়ী, তার একটি শ্রীচরণ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এবং পরিধিতে লক্ষ্য করবার মতো। দেরাজের ফাঁক দিয়ে অমল আর বুবু তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে।

মারোয়াড়ীটা বলছিল—হামি যো বোলসে তোমরা বুঝতে পারসে না। হামি বোলসে উসকো সুধো পায়ের নেই, মুখ ভি আচ্ছাতরে বানতে হোবে। কাহে নেই, উ যদি চিল্লায় তো পাড়াকা আদমি সব তো জান যায়···

বাঙালী গুণ্ডাদের একজন বলে, উ বহুৎ ঘড়ি বুঝে লিয়েছে বাবুজী! তবুতো হামলোক ভি পাকড় যায় আউর হামলোকাভি জান যায়!

মারোয়াড়ী: ঠিক হ্যায়! আভি বাৎ এই যো বাত দো-ঢ়াই বজে যোই বখৎ ও ঘুমতে যাবে···

এক নম্বর গুণ্ডা বিস্ময় প্রকাশ করে। রাত দুটোর সময় ভি ঘুমবে এইসা তো কভি শুনিনি! আপ কেয়া বোলতা বাবুজী?

গুণ্ডা নম্বর দুই ফিসফিস করে: আরে বোলতা কিবে, ভীমকল বল। পাখ না দেখেছিস? বোলতার কামড়ে কখনো অ: হয়?

নম্বর এক: যাঃ, গোদ নিয়ে ঠাট্টা করিসনে, তোরও হতে পারে একদিন। তোর গলাতে হয়ে বসবে কিনা কে জানে!

মারোয়াড়ী: ঠাট্টা কা কোই বাত নেই! ঘুমতে যাবে লেকিন ঘুমবে না। সমঝছে না? ঘুমতে যাবে লেকিন ঘুমনে নেহি যায়গা। সমঝেসে? টহলবে না লেকিন ঘুমবে। আঁখ বন করকে এইসা—। নিজের চেষ্টার দ্বারা মারোয়াড়ীটা যথাযথ উদাহরণের দৃষ্টান্ত ছায়।

প্রত্যক্ষ দর্শনে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ, ।—ওঃ, এইবার বুঝেছি। নিদ যাবে তাই বলো।

—হঁ, হ, ওহি বাত! তব সব ঠিক হোয়েসে? হাত পা বানকে

ছালাকা ভিতর সমঝেসে? মুখভি বানতে হোবে! লাগনদাসকো হাম টেলিফুঁক কিয়া হ্যায়—যানেসেই মোটর মিল যায় গা! আউর কেয়া?

অনুমানপরবশ হয়ে গুণ্ডা দুটো হাত বাড়াতেই মারোয়াড়ীটা ওদের হাতে দুখানা নোট গুঁজে দ্যায়। —ঠিক ঠিক করনা। হাত সাফাইসে সেকলে দোদো হাজার। আও, ঘরঠো দেখলা দেই—

ওরা চলে যেতেই অমলরা বেরিয়ে আসে। জানলা ডিঙিয়ে সোজা সেই রোয়াকেই। তখন আর সেখানে জনতার বাধা নেই। ষাঁড়ের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে বহুক্ষণ আগেই তার পেছনে পেছনে তারা রওনা দিয়েছে।

নেমে এসে অমল প্রকাণ্ড বাড়িটার গেটের প্রস্তর-ফলক লক্ষ্য করে। তাতে লেখা আছে শুধু: কৃতান্তচাঁদ লোহিয়া।

বুবুকে জিজ্ঞাসা করে, কি বুঝলি?

—গোদ, আবার কি? অবহেলার সঙ্গে উত্তর দ্যায় বুবু। ওই জিনিস পিঠে হলেই কুঁজ, আর গলাই হলেই গলগণ্ড।

—তুই কিছু বুঝিস না। নেহাত তুই ছেলেমানুষ। অত্যন্ত হতাশ হয়েই অমল বলে। —নিতান্তই নেহাত ··!

আবার বোঝাবুঝির কি আছে? বুবু অবাক হয়ে যায়। তবে কি ও গোদ নয়? গুণ্ডাটা যে বলল গোদই ওটা।

—ধুত্তোর গোদ। তোর মাথায় কিছু নেই। তোকে নিয়ে যদি কোথাও যেতে হয় তাহলে মারাই পড়বো দেখছি। চাঁদে কিম্বা মঙ্গলগ্রহে তোর সঙ্গে বেড়াতে যাবার আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সেটা বাতিল করতেই হোলো।

এতবড় প্রলুব্ধকর যাতায়াতটা কেন স্থগিত হয়ে গেল, তার কোন বিশেষ অপরাধে বুবু তা ভেবে পায় না।

—ওই নাম লেখা পাথরখানা দেখেছিস? অমল জিজ্ঞেস করে।

—কত কিলো? বুবু জানতে চায়। —তাই জিজ্ঞেস করচিস?

—কিলো না তোর মুণ্ড! যত বলি এ্যাডভেঞ্চারের বই পড় তা তো পড়বিনে, মাথা খুলবে কিসে? দাদা ওই জন্যেই আমাকে কত বই কিনে দ্যায় আর হরদম পড়তে বলে।

বুবু গুম হয়ে থাকে, তার দস্তুর মত রাগ হয়েছে তখন।

পাথরে নামটা দেখেছিস? অমল বলেই চলে, মারোয়াড়ী। আর মারোয়াড়ী হলেই খুব বড়োলোক। ওই কৃতান্তচাঁদ লোকটাও নিশ্চয় খুব বড়োলোক। আর ঐ যে গোদালো মারোয়াড়ীটা দেখলি ওটাই এই বাড়ির। ...ও হোলো গে ঘরের শত্রু বিভীষণ। ও করেছে কি, এই ভাড়াটে গুণ্ডার দলকে হাত করেছে টাকা দিয়ে। ওদের সাহায্যে আজ রাত দুটো আড়াইটার সময় বেচারা কৃতান্তর মুখ হাত পা বেঁধে মোটরে করে কলকাতার কাছাকাছি কোথাও, খুব সম্ভব কোনো পোড়োবাড়ি কি ভূতুড়ে বাড়িতে—ভূতুড়ে হলেই ভালো হয়, এ্যাডভেঞ্চারটা সেখানেই বেশি জমে ওঠে—ভূত আর গুণ্ডা দুদলে মিলে কিলোকিলি বেঁধে গিয়ে খুব রোমাঞ্চকব হয় কিনা?

কৌতুহলের আস্বাদে বুবুব রাগ ততক্ষণে জল হয়ে এসেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। তারপর ভূতুড়ে বাড়িতে কৃতান্তচাঁদকে নিয়ে গিয়ে মা কালীর কাছে বলি দেবে এই তো?

—পাগল! দশ বিশ বছর আগে হলে তাই করত বটে, কিন্তু এখন অন্যরকম কায়দা। ওকে বলি দিয়ে কি করবে? ওর মাংস তো খাওয়া যাবে না। পাঁঠা তো নয়, একেবারেই অখাদ্য যে! ওকে সেখানে নিয়ে গিয়ে গুম করে রাখবে। এদিকে চিঠি দিবে কৃতান্ত-চাঁদের আত্মীয়দের কাছে যে এত টাকা পেলে—এক লাখ কি দু লাখ কি দশ লাখ কি জানি—ওকে ছেড়ে দেবো নতুবা না। এ সমস্ত কালই জানতে পারা যাবে। কালকেই! সব খবরের কাগজেই বেরুবে কিনা। বড় বড় হেড লাইনেই বেরিয়ে যাবে।

—বলিস কি? তুই কি করে য়্যাতো জানলি?

—আমি জানতে পারি। আমার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। সমস্ত শহরে কিরকম সোরগোল পড়ে যায়, দেখিস কাল।

—তাহলে আব বনগাঁয় আমাদের যাওয়া হচ্ছে না? একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বুবু বলে।

—এই অপরিচিত লোককে আসন্ন বিপদের মুখে ফেলে আমরা যাবো বনগাঁয়? তুই বলিস কি? অমল হাঁ হয়ে যায়।

—পুলিশে খবর দিলেই হয়। আব খববের কাগজ? সে তো বনগাঁতেও পাওয়া যায়, আমি জানি।

—হ্যাঁ। পুলিশ! পুলিশে এ সবেব কিনারা করতে পারে নাকি?

তাদের আব পাবতে হয় না। যারা ডিটেকটিভ বই লেখে, কেবল তারাই পারে, আব পাবে যাবা সেসব বই পড়েছে—তাছাড়া আব কাক কম্ম না।

—বেশ তো, আমরা বনগাঁ থেকে না হয় এব কিনারা কবব। কাগজ পডে পড়ে মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে করা যাবে।

—তা কি হয়? আমরা আসছি আবাব বাত দুটো আড়াইটার সময়। বেচারা কৃতান্তচাঁদ। খুব সম্ভব বৃদ্ধ, আব আমার বিশ্বাস, খুব অমায়িক প্রকৃতি। প্রায়ই এই রকম হয় এইসব নিরীহ ব্যক্তিরা। বেচারা কৃতান্তচাঁদকে বাঁচাতেই হবে আমাদের।

—কি কবে বাঁচবো আমরা। কতগুলো গুণ্ডা আছে কে জানে! আমি তো ভালো বক্সিংও জানিনা! যুয্যুৎসু তো নয়ই।

—তা দেখিস তুই তখন! আমিই তো বাঁচাবো। জানিস তো আমার নাম? অমলকুমার। 'বিমলকুমারের' আমি মাসতুতো ভাই —তা জানিস?

—থাক, থাক আব বলতে হবে না। বাধা দিয়ে বুবু বলে।

ফুলিয়ে ওঠানো বুককে আবাব চুপসে আনে অমল। ছদ্মবেশে আসতে পারলেই ভালো হয়। অদলবদল করে নেব না হয়—আমার

কাপড় জামা তুই পরিস, আর তোর কাপড় জামা আমি পরবো। তাহলেই ছদ্মবেশ হয়ে গেল। একজোড়া করে নকল গোঁফ পেলে তো কথাই ছিল না। নেহাত না-মেলে, অগত্যা, কালি লাগিয়েই কাজ সারতে হবে···

গোঁফের প্রস্তাবে বুবুর আগ্রহ হয়। সে আমি করে দেব তোর। করে দিতে পারব। কলমের পেছন দিয়ে আমি দিব্যি গোঁফ আঁকতে পারি। একদিন দিদি অকাতরে ঘুমোচ্ছিল। আমি দিদির করে দিয়েছিলাম, বাবার মত বেশ লম্বা চওড়া জাঁদরেল গোঁফ একখান! জেগে উঠে দিদির সে কি রাগ! বাব্বা!

—আচ্ছা, সে হবে এখন গোঁফ। গোঁফের জন্য অত ভাবনা নেই। ছদ্মবেশই হোলো গিয়ে আসল। তারপর এখানে বসে, এই আড়াইটায়, মোটর আসার অপেক্ষা করব আমরা। তারপর কি কি করতে হবে, তা তখন মাথা ঘামিয়ে বার করা যাবে।

—লগিনদাসের মোটর, আমার বেশ মনে আছে।

—একটা নোটবই কিনে ফেলতে হবে এক্ষুণি। কতক্ষণই বা মনে থাকবে এসব কথা? চটপট টুকে ফেলা চাই সঙ্গে সঙ্গে।

—চাই-ই তো। বুবুও মুখখানাকে ডিটেকটিভের উপযোগী গুরু-গম্ভীর করে আনে।

—আরেকটা কথা। আঙুল কামড়ে বলে অমল। —ছদ্মবেশের সঙ্গে ছদ্মনামও যে দরকার। অমল বুবু বলে ডাকাডাকি করলে চলবে না তো।

—চলবেই তো না! বুবু ঘাড় নাড়ে।

—আমি দুটো নাম ঠিক করেছি···

—ভাল নাম তো?

—চমৎকার! তোর নাম হল গিয়ে স্মিথ—কেমন?

—বেশ। আর তোমার?

—আমার? আমার নাম ব্লেক, রবার্ট ব্লেক!

—স্মিথ যে ব্লেকের সাকরেদ! অমলের চেয়ে খাটো হতে বুবুর আত্মসম্মানে ঘা লাগে। এই নামকরণে ও সুখী হতে পারে না। ওকে ব্লেকত্ব দেয়া হলে খুশী হতে পারত বরং।

—উহুঁ···। ও ভালো নয়। য়্যাতো স্বদেশী নাম থাকতে বিদেশী কেন? আমি নাম ঠিক করেছি। বুবু বলে।

—কী শুনি?

—আমার নাম হোল গিয়ে গোবিন্দরাম।

পাঁচকড়ি দে'র বইগুলো পড়া ছিল বুবুর। অনেকদিন আগেই পড়া ছিল। গোয়েন্দার নামটা আগেভাগেই সে আত্মসাৎ করে রাখে।

—আর আমার নাম?

বুবু সমস্ত মন হাতড়ায়, স্মৃতিশক্তি তোলপাড় করে তোলে, কিন্তু পাঁচকড়ির বই থেকে আর কোনো গোয়েন্দাই ওর মানসপটে উঁকি ঝুঁকি মারে না। অমলের কাছ থেকেই ধার করে পড়ে বার করেছে—এতদিনে কি আর ওসব মনে থাকবার? বুবু, যথাসাধ্য বইগুলোর নাম মনে করে একে একে, ওর মধ্যে কোনটা অমলের সঙ্গে খাপ খাবে; মনে মনে ভেবে ছাখে।

মায়াবী? মনোরমা? নীলবসনা সুন্দরী? নীলবসনা—?

উহুঁ, এ নাম তো কিছুতেই দেয়া যায় না। দিতে গেলে এক্ষুণি খেপে গিয়ে পিটতে শুরু করে দেবে অমল। জবীন্মৃত রহস্য? হত্যাকারী কে? হরতনের নওলা? নাঃ, এ সবের কোনটাই ওর মনঃপুত নয়। ওর নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না, অমলের কি হবে—ও তো আরো বেশি সৌখিন! তাহলে?

অবশেষে যেন একটু আলোকের ইঙ্গিত পায়। —আচ্ছা, তোর নাম কেন থাক না। বিষম বৈমূচন? পাঁচকড়ির একখানা বইয়ের নাম খুব লাগসই লাগে।

—বিষম বৈমূচন?

—হ্যাঁ—এমন মন্দ কি ?

—তুমি গোবিন্দরাম আর আমি বিষয় বৈমূচন ? কালবৈশাখীর মত বিষম ঘোরালো হয়ে আসে অমলের মুখ। —বটে ?

—ক্ষতি কি তাতে ? —ভয়ে ভয়ে বুবু বলে।

—গোবিন্দরামগিরি বের করছি। বড্ড বাড় হয়েছে তোমার। অমল ভয়ানক রেগে যায়, কিন্তু কী যে করবে ভেবে পায় না। এক ঘুসিতে স্মিথকে এক্ষুণি ব্ল্যাকস্মিথ বানিয়ে দিতে চায়, কিন্তু তাহলে ওর নিজের চলে কি করে ? আজ রাত্রে কৃতান্তকে উদ্ধার করবার আশা নিতান্তই ছাড়তে হয় যে তাহলে। একা কি অত দায়িত্ব নেয়া ওর পক্ষে সম্ভব—আর যদি সম্ভবও হয়, তা কি সঙ্গত ? স্মিথ ছাড়া কি ব্লেকের কখনো চলেছে ? স্মিথকে তার প্রাপ্য গৌরব থেকে ব্লেক কি বঞ্চিত করতে চেয়েছে কোনদিন ?

—অবশেষে অনেক বিবেচনা করে নিজেকে সে সামলে আনে। —ওসব আমি জানিটানি না। আমার শেষ কথা। আমি ব্লেক আর তুমি স্মিথ। এতে যদি রাজি না থাক তো তোমার সঙ্গে এই শেষ। জন্মের মত আড়ি।

—তাহলে তুমি শুধুই ব্লেক আর কিন্তু মিষ্টার স্মিথ ? বুবুর নরম গলার সন্ধির সূত্র—ভাবের অভিসন্ধি।

—বেশ তাই। অমল হাসিমুখেই মিষ্টারত্ব ছেড়ে দ্যায় বুবুকে। অম্লানবদনেই ছেড়ে দেয় বুবুকে। দুজনের সম্পর্কে ফের আবার মিষ্টি হয়ে ওঠে।

রাত দেড়টা কি দুটোই হবে, মিস্টার স্মিথ সমভিব্যাহারে রবার্ট ব্লেক কৃতান্তচাঁদের বাড়ির উপকণ্ঠে হাজির হয়েছেন।

রাস্তার ল্যাম্প পোস্টে নোটবুকটা খুলে চট্ করে দেখে নিয়েই ব্লেক বলে ওঠেন—দো-ঢ়াই ! এখনো দেরি আছে।

—কিসের দেরি ? স্মিথ জিজ্ঞাসা করে।

—সেই গোদালো মেড়োটা সকালে বলল না যে রাত দো-ঢ়াই

বাজে কাজ সারতে হবে? মেমারি স্টেশনটা কি বাড়িতে ফেলে এসেছে মিস্টার স্মিথ?

—হ্যাঁ, তোমার দাদার জিম্বায়।

—ভালো কাজ করোনি। পদে পদেই এখন মাথার দরকার।

ইতিমধ্যে মোড়ের গির্জার ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নেয় স্মিথ—বাবা। এখন মোটে এক-ঢ়াই। এখনো একঘণ্টা!

বাড়িটার কাছাকাছি, সকালেব নির্বাচিত সেই আবডালকরা জায়গাটায় দুজনে গিয়ে বসে। পাশের ডাইং ক্লিনিং-এর দোকানের হাতে আঁকা লম্বা সাইনবোর্ডটা গ্যাসের আলোকে আড়াল করেছে সেইখানে, তারই অন্ধকার ঘুপটির মধ্যে অনেকটা আত্মগোপনের সুবিধে রয়ে গেছে।

ব্লেক ফিসফিস করে বলেন। এখান থেকে আমরা সবাইকে দেখতে পাব, অথচ আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। এখন আমাদের বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে সবাইকার গতিবিধি কার্যকলাপ, চাল-চলন। সব কিছুই লক্ষ্য করতে হবে। খুব সামান্য জিনিস—একটুকরো ইঙ্গিতও ফেলনা নয়—কী থেকে কোন্ ক্লু পাওয়া যায় কেউ বলতে পারে না।...

পাঁচকড়ি দে কিম্বা দীনেন রায়ের কোন্ বইটা থেকে ব্লেক গড়গড় করে আউড়ে যাচ্ছেন। স্মিথ মাথা ঘামাবার চেষ্টা করে।

একটু দম নিয়েই ব্লেকের আবার শুরু হয়। —হ্যাঁ, সবার উপরেই লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের। যারা এই রাস্তা দিয়ে যাবে, বাড়িটার দিকে কটাক্ষ করবে কিম্বা একেবারে ভ্রূক্ষেপ করবে না, কিম্বা যেতে যেতে কাশবে, হেসে দেবে, কিম্বা হাসবে না—বুঝতে পেরেছ? এমনকি আশপাশের বাড়ির লোকদের পর্যন্ত আমরা রেহাই দেব না। মোড়ের পাহারাওয়ালাটাও বাদ না—কী জানি সেও হয়তো এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে। সেটা অবশ্য তত সম্ভব নয়, তবে ও আসল পাহারাওলা কিনা তাই বা কে বলবে—হয়তো ওদের দলের কেউ পাহারাওলা

সেজে পাহারা দিচ্ছে! তাও হতে পারে। এমনো তো হয়। হয় না কী?

ব্লেক বলেই চলেন, কিন্তু স্মিতের কোনো সাড়া-শব্দই নেই। সন্দিগ্ধ হয়ে ফিরে তাকান ব্লেক। এ কি! স্মিথের দেহে নিস্পন্দ কেন? একেবারে অসাড়, দেয়ালে হেলান দেওয়া যদিও, তবুও প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। বেঁচে আছে তার কোন দুর্লক্ষণই নেই যেন। ব্লেকের বুক কেঁপে ওঠে, ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ ওকে খুন করে গেল নাকি তার বক্তৃতার ইত্যবসরে? ব্লেকের পিলে পর্যন্ত চমকে যায়। নোটবুক খুলে দুর্ঘটনাটা যথাযথ টুকবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্লেকের হাত কাঁপতে থাকে। চোখ ছলছল করে আসে, কান্না পায় ব্লেকের।

গায়ে হাত দিতেই ধড়মড় করে ওঠে স্মিথ। - কা রে অমলা?

এবার ব্লেক যায় চটে। —য়্যাঁ। এই কি স্মিথের মতো কাজ? দারুণ দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এইভাবে নাক ডাকানো?

—বড্ড ঘুম পাচ্ছে ভাই। স্মিথ বলে।

—ভাই? আমি তোমার ভাই নই, তা জানো? এত কষ্ট করে আমাদের ছদ্মবেশধারণ সব তুমি ব্যর্থ করে দেবে দেখছি—। ব্লেকের রাগ কিছুতেই বাস মানে না!

ভুল হয়েছে রবার্ট ব্লেক। যেতে দাও। স্মিথ এবার কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে—কিন্তু তার কাঁচুমাচুতো কতক্ষণের? পরমুহূর্তেই নিদ্রালু প্রাণ তাকে উপদেশপ্রবণ করে তোলে। —এস না কেন, এই ফাঁকে আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই। দো-ঢ়াইয়ের তো দেরি আছে। ততক্ষণ তোফা একচোট হয়ে যাবে এখন। আর মোটর এলে হর্ণ দেবেই, আওয়াজ পাবই আমরা—আপনা থেকেই তখন জেগে উঠব। তুমি কি বলো ব্লেক?

অমল আপত্তি করে। —তা কি করে হবে? এতখানি দায়িত্বের গুরুভার মাথায় নিয়ে সে কি কখনো অকাতরে ঘুমোতে পেরেছে এর

আগে? নিজের প্রাচীন ইতিহাস যতই সে খুঁটিয়ে ছাখে, ততই তার অভ্যন্তরে ব্লেকের আত্মা প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে।

—সজাগ ভাবে ঘুমোলেই হয়। স্মিথ জানায়। —লোকে ভাববে আমরা ঘুমোচ্ছি কিন্তু আসলে আমরা চোখ বুজে পড়ে থাকব। তাতে করে তাদের চালচলন লক্ষ্য করা কত আরো সহজ হবে!

ব্লেক একটু চিন্তা করেন। ঘুম তারো যে না-পাচ্ছিল তা নয়। স্মিথের কথাই তাঁর সমীচীন মনে হয়। তিনি কিছু বলেন না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই রাস্তার লোকদের ভার রাস্তার ওপরেই ছেড়ে দিয়ে সমস্ত গতিবিধি পর্যবেক্ষণের কথা বেমালুম ভুলে ডিটেকটিভের দারুন দায়িত্ব হজম করে ঘুমন্ত স্মিথের গায়ে নিজেও অবিলম্বে ঢুলতে শুরু করে দ্যায়—

ওই দুই ঢোঢুল্যমান বাললকে দেখে, ওরা যে শার্লক হোম্‌সের প্রতিদ্বন্দ্বী, ঘুণাক্ষরেও কি কেউ সন্দেহ করতে পারে? উঁহু! পারে না। ওরা গোয়েন্দাগিরিতে রীতিমতই পেকেছে, এই থেকেই তার প্রমাণ। ওরা যা নয়, ঠিক তাই লোকে টের পাচ্ছে, ওরা যা তার ধার কাছ ঘেঁসেও কারও আন্দাজ যাচ্ছে না—এইখানেই ওদের বাহাদুরি। দুঃখের বিষয় ওদের এই বাহাদুরি লক্ষ্য করবার কেউ ছিল না, কেননা ওদের চোখ বোজার আগেই, পাড়ার সবাই তখন অচির নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে।

ওদের ছদ্মবেশ একেবারেই নিখুঁত বলতে হবে। ব্লেকের কাপড় জামা স্মিথ পরেছে এবং স্মিথের ব্লেক। যার শ্লিপার পর্যন্ত কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। গরুর গাড়ির চাকার কেন্দ্রস্থল থেকে তেলকালি নিয়ে ছদ্মগোঁফ বানাতেও ওরা গেছল কিন্তু গাড়োয়ানের কাছ থেকে ব্যাঘাত পেয়েছে। আরেক জায়গায় এক দারোয়ানের সামান্য আপত্তিতে এক পিপের অন্তর্গত আলকাতরা ওদের গোঁফে পরিণত হবার সুযোগ পায়নি।

চাকার তেলকালি সংগ্রহের সময়ও কথা কাটাকাটি কম হয়নি।

—যার গাড়ি সে তো কিছু বলছে না, তুমি কেন বাধা দাও বাপু? বলেছে অমল।

—আমারই তো গাড়ি! গাড়োয়ান বলতে চায়। একটু অবাক হয়ে সে বলে।

অমলের চোখ কপালে ওঠে। —তোমার গাড়ি? বাঃ! বললেই হোলো! তমি কি গরু? গরুর গাড়ি তো এ!

বুবু ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। — গাড়ির জমিদার হোলো গরু, তুমি কেবল চালিয়ে থাক; তুমি তার ম্যানেজার মাত্র বুঝেছ?

বোঝে কিনা সেই-ই জানে কিন্তু আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে, জমিদারি হাঁকিয়ে সটান সে চলে যায়।

কিছুদূর গিয়ে তার পরে, এক গুদামে সামনে মুখখোলা এক আলকাতরার পিপে ওরা দেখতে পেয়েছে। 'গোঁফকা বাস্তে দরকার' গুদামের দারোয়ানকে একথা বলতেই, আনন্দের আতিশয্যে দারোয়ানটা যেন উথলে ওঠে, সমস্ত পিপেটাই দিয়ে দিতে চায় তক্ষুণি। অসাধারণ বদান্যতা অসামান্য হয়ে পড়ে।

—নেহি নেহি, খুব জারাসে হোলেই হোবে। ওরা বলেছে।

—লেকিন থোরা মুসকিল আসে খোকাবাবু—। আলকাতরা দিয়ে গোঁফ বানানোর ভয়াবহ ভবিষ্যত ব্যক্ত করে দারোয়ান। এই গোঁফ নাকি একেবারে জাঁকিয়ে বসে থাকবে চিরদিনের মতো। কিছুতেই আর ওঠানো যাবে না ওকে। তাহলে তো ভয়ের কথাই বটে।

অমল জিজ্ঞাসা করছে বুবুকে। —তাহলে কি আমাদের আসল গোঁফ উঠতে চাইবে পরে? লজ্জা পাবে হয়তো। এ-গোঁফকে ঠেলে ফেলে উঠতেই পারবে কিনা কে জানে! তুমি কি বলো স্মিথ?

একটা সমস্যাই বটে। বুবুও মুখখানা যথাসাধ্য সামস্থিক করে আনে। আর যদিই ওঠে সেও তো এক বিপদ! ডবল গোঁফ নিয়ে আমরা মুখ দেখাব কি করে?

অতএব গোঁফ লাভ ওদের আর হয়নি, কিন্তু ওটা বাদে, ওদের ছদ্মবেশে কোথাও কোনো বিচ্যুতি আছে একথা কেউ বলতে পারবে না। এবং ওরা যে এ মুহূর্তে ঢুলছে এও বিশ্বাস করা শক্ত। খুব সরর এটা একটা পাকা চাল ওদের, আগাগোড়াই অভিনয়, সবাইকে জানাতে চাচ্ছে সে ঢুলছে, কিন্তু আসলে ওই কায়দা করেই সবার ওপরে ওরা নেকনজর রেখেছে।

রাত প্রায় তিনটা, এমন সময় একটা বাস প্রায় নিঃশব্দেই এসে দাঁড়ায় বাড়ির গেটে। ব্লেক আর স্মিথ তখন দেয়ালে গা রেখে গড়িয়ে পড়েছেন রাস্তায়। সেইখানেই তাঁরা তথাকথিত সজাগ অবস্থায়, ড্রেনের কিনারায়, পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে একেবারে জড়ীভূত। বাসের আগমন ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তাঁরা।

বাসের হেডলাইট মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠেই নিভে যায়। সামনের রাস্তাটা কতখানি এবং কতদূর পর্যন্ত পরিষ্কার সেই আলোয় স্পষ্ট হয়। সদর গেট খোলাই ছিল, দুজন লোক বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, বাসের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা বাড়ির মধ্যে চলে যায়। ড্রাইভার নেমে এসে ছেলে দুটিকে ধাক্কা মারে। —এই, এই! এখানে রাস্তায় শুয়ে কেন রে? একি শোবার জায়গা নাকি? ওঠ্ ওঠ্, ভাগ্, এখান থেকে। চাপা পড়বি। পালা!

ধড়মড়িয়ে ওরা ওঠে। চোখ রগড়াতে রগড়াতেই সমস্ত পরিস্ফুট হয়। এই সেই গাড়ি। ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যকলাপ এতক্ষণ সব শুরু হয়ে গেছে বোধহয়।

পাশের একটা ছোট্ট চোরাগলির মুখে গিয়ে ওরা দাঁড়ায়। রুদ্ধ নিশ্বাসে অতঃপরের অপেক্ষা করে!

—মিস্টার স্মিথ

—হ্যালো ব্লেক।

—কী বুঝছ ব্যাপার?

—সুবিধে নয়।

চাপা গলার পরামর্শ এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে, এমন সময়ে সেই চারজন লোক ফিরে আসে। এসে ড্রাইভারকে সঙ্গে করে নিয়ে আবার ভিতরে যায়।

—এখন তো কেউ নেই, আয় আমরা টায়ার ছ্যাদা করে দিই। স্মিথ বলে। —তাহলে আর নিয়ে যেতে পারবে না।

—তাতে কি হয়? ব্লেক আপত্তি করেন। —তাহলে তো কিছুই হোলো না!

—লোকটা তো বেঁচে গেল।

—বিপদে পড়ার আগেই উদ্ধার? মজা হোলো কই? মজাই তো আসল।

—ভাই ব্লেক, বাসখানা দেখেছিস? কেমন অদ্ভুত রকমের!

—তাই তো ভাবছি, এ-ধরণের বাস তো কলকাতায় বড় চলে না।

সত্যি, অনেকটা অ্যাম্বুলেন্সের মতো কি রকম যেন বাসখানা, পেছন দিয়ে প্রবেশ পথ, বেশ প্রশস্তই পাদানি আছে সংলগ্ন। দু'ধারেই কয়েকটি করে জানলা, কিন্তু খড়খড়ির সব ভেতর থেকে বন্ধ। বাসের মাথায় ঘোড়ার গাড়ির ছাউনির রেলিং-এর মতো বারান্দা দেয়া। বোধহয় মালপত্র—ওরফে বামাল পত্র রাখার জন্যই।

এমন সময়ে সেই পাঁচজন লোক বস্তাবন্দি কৃতান্তচাঁদকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে। গাড়ির পেছনের দরজা খোলাই ছিল, তার ভেতরে ফেলে দেয়, দিয়ে দরজা এঁটে বাহির থেকে গলা লাগায়। ড্রাইভার মোটরে স্টার্ট দিলে, ওদের দুজন বাড়ির ভেতর চলে যায়। গিয়ে সেই মুহূর্তে সদর গেট বন্ধ করে। বাকী দুজন সামনে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে।

ব্লেক আর স্মিথ তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে আসেন চোরা গলি থেকে। একলাফে উঠে পড়েন পেছনের পাদানির ওপর। বাস ছেড়ে দেয়, ফাঁকা রাস্তায় বেশ সজোরেই চলতে থাকে। এত কাণ্ড সমস্তই এক পলকের মধ্যে ঘটে যায়।

বাস চলতে থাকে। এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে হাওড়ার পুলে গিয়ে পড়ে, পুল পেরিয়ে, স্টোন ছাড়িয়ে চলতে থাকে। তারপর এক অদ্ভুত রাস্তায় এসে পড়ে—ব্লেক কিংবা স্মিথ এ-পথে কোনদিন আসেননি। প্রকাণ্ড রাস্তাটা যেন সরীসৃপের মতো অগাধ সম্মুখে নিজেকে সুবিস্তৃত করেছে। তার দুধারেই বড়ো বড়ো গাছ, যত দূরই যাও, যতো জোরেই চলো, এ রাস্তার যেন আর অন্ত নেই।

—বুঝতে পেরেছি! স্মিথের কানে কানে বলেন ব্লেক। —ইতিহাসে পড়িসনি। এই সেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ট্রাঙ্কদের গ্র্যাণ্ডত্ব দেখেই টের পেলাম। শেরশাহ বানিয়েছিলেন এই রাস্তা। দিল্লী পর্যন্ত চলে গেছে এমনি বরাবর।

—তাহলে কি আমরা দিল্লী যাচ্ছি নাকি?

—কে জানে? ভেতরে আধসের শাহের অবস্থা কি, তাই বা কে বলবে!

এতক্ষণ ঝড়ের বেগে ছোটার পরে গাড়ির গতি দক্ষিণ সমীরণের মতো মৃদুমন্দ হয়ে আসে। প্রায় ঘণ্টাখানেক দৌড় ঝাঁপ গেছে, অমল মনে মনে আন্দাজ করে! দৌড় কমার সঙ্গে সঙ্গে জোর জোর হর্ণ বাজে; ঘন ঘন বাজতে থাকে এবং একটু পরেই অনতিদূর থেকে অত্যুগ্র টর্চের আলো এসে পড়ে গাড়ির ওপর।

ডানদিকে পাঁচিল ঘেরা বেশ বড় বাগান, তার পাশ দিয়েই গাড়ি এখন চলেছে। বাগানের সদর গেট এইমাত্র খুলল, দেউড়ি অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে যমদূতের মত একজন লোক, বোধকরি মালি-টালিই হবে, পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে টর্চার করছিল তার টর্চ দিয়ে।

মুহূর্তের জন্যেও না থেমে, সোজা মোড় ঘুরে গেটের ভিতর দিয়ে সটান বাগানের মধ্যে চলে যায় গাড়ি। গেটও বন্ধ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। অমল আর বুবু ভাববারও অবকাশ পায় না। রাস্তায় থাকতে থাকতেই লাফিয়ে নেমে পড়ে পালাবার কথা ওদের মনে

উদিত হবার আগেই, নিজেদের ওরা দেখতে পায় বাগানের মধ্যে এবং একেবারে বাগানের মাঝখানে। অবিচলিতভাবে ভীত হয়েই ছাখে এই বিপর্যয়।

ওদের আকস্মিক অভ্যুদয়ে গুণ্ডারাও কম অবাক হয় না। এরা আবার এল কোত্থেকে? ড্রাইভারটি ভালো করে লক্ষ্য করে বলে। এদের আমি যেন লোহিয়ার বাড়ির সামনে দেখলাম—ঠিক এই রকম —আমার বিলকুল মনে হচ্ছে।

—এত রাত্রে ওখানে কি কাজ ছিল ওদের? গুণ্ডাদের একজন প্রশ্ন করে। কি করছিল ওরা?

অন্যজন উত্তর দেয়, ভদ্রলোকের ছেলে বলেই তো দেখাচ্ছে তারপর কে জানে।

ড্রাইভারের মনে কিন্তু সংশয় জাগে। —টিকটিকির বাচ্চা নয় তো?

ওদের অন্যতম তখন জিজ্ঞাসা করেই বসে। —এই তোরা কারা রে?

টিকটিকি গিরগিটি নই, কারুর কাচ্চা বাচ্চা তো নই। অমল জবাব দেয়।

—যেই হও বাপু, আজ রাত্রে আর ছাড়ান নেই তোমাদের। রাত্রের মতো তো বামালের সঙ্গে বন্ধ থাকো এক ঘরে—তারপর কালকের কথা কাল। সে তখন দেখা যাবে!

---উহুঁ, এখন মোটেই ওদের ছাড়া হচ্ছে না। অন্যজন বলে, পুলিশেরা আজকাল বাচ্চা বাচ্চা সি. আই. ডি. লাগায় তা জানিস? দরকার কি, কদিনের আর মামলা। এই কটাদিন এঁরাও থাকুন ঐ ইঁদুর কলে, উনিও থাকুন। তিনজনেই—হ্যাঁ। এই বলে বাসের মধ্যে অবরুদ্ধ কৃতান্তচাঁদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে লোকটা।

—চল, হতভাগাদের নিয়ে ঘরে বন্ধ করে আসি আগে। তারপরে

মাল খালাস হবে। তিনটেই থাকবে, মালির হেফাজতে ; ও একাই সামলাতে পারবে খুব।

বাগানের মাঝামাঝি একটা ছোট্ট বাড়ি, তারই একখানা ঘরের চাবি খুলে অমল আর বুবুকে ওরা ঠেলে দেয় ভেতরে। অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। একটু পরে, আরেকটা গৃহ প্রবেশের ভারী আওয়াজে : কৃতান্তচাঁদের আগমনও ওরা টের পায়। পর মুহূর্তেই বাইরে থেকে দরজায় চাবি লাগানোর শব্দ কানে আসে।

—অমল !

—কিরে ?

—এই দুটো লোক কিন্তু সেই দুটো লোক নয়। আস্তে বলে বুবু।

—যাদের সকালে আমরা দেখলাম তারা নয়।

—তাদেরই দলের। তারা কর্তা আর এরা সাকরেদ।

—কৃতান্তবাবুর কোন সাড়াশব্দ নেই তো। মারা গেল নাকি ভদ্রলোক ?

—এতক্ষণ যা ধকল গেছে আশ্চর্য নয়। অমল বলে, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস ? উনি যে উচ্চবাচ্য করছেন না তার কারণ আছে।

—ধরা পড়বার ভয়ে ? বুবু উৎসুক হয়ে ওঠে।

—ধরা তো পড়েইছেন, এর বেশি আর কি ধরা পড়বেন ? তা নয়, মুখ বাঁধা যে।

—ও, হ্যাঁ। তাই বটে ! বুবুর মনে পড়ে যায়।

বুবু চাপা গলায় বলে, ফোঁস ফোঁস করছেন শুনতে পাচ্ছিস্ ? ভারি মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক !

ওঁকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। অমল ডাক দেয়। —কৃতান্তবাবু ! ও কৃতান্তবাবু।

কৃতান্ত নীরব।

—আপনাকে বোলে প্রত্যুত্তর দিতে হবে না। জানি আপনার মুখ বাঁধা। কান বাঁধা নয় নিশ্চয়ই। আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন তো? আপনার কোনো ভয় নেই, আমরা এখানেই আছি। আপনার নিকটেই, আপনার সঙ্গে এক ঘরেতেই রয়েছি। আমাদের আপনি আত্মীয়ের মতোই ভাববেন। আমরা আপনাকে উদ্ধার করব। আপনি একটুও বিচলিত হবেন না। গড় গড় করে অমল বলে যায়।

বুবু শুরু করে তারপর। —রবার্ট ব্লেক ও মিষ্টার স্মিথের নাম আপনি অবশ্যই শুনেছেনই। শুনে না থাকলেও বইয়ে পড়েছেন নিশ্চয়। খুব বিখ্যাত দুজন ডিটেকটিভ। আমরা হচ্ছি তারাই। আপনার উদ্ধার আসন্ন, সে-বিষয়ে কোনো ভুল নেই।

অমল বলে, আপনি যে কোথায় ঠিক আন্দাজ পাচ্ছি না। নইলে এখুনি গিয়ে আপনার মুখের বাঁধন খুলে দিতাম। অজানা ঘরে অন্ধকারে নড়তেও ভয় করছে। না, ভয় ঠিক নয়, তবে অন্ধকারে নড়াচড়া সমীচীন না তো? আপনি যদি আমাদের আওয়াজ শুনতে পেয়ে থাকেন, মানে, আপনার কান খোলা থেকে থাকে, তাহলে স্বচ্ছন্দে আমাদের কাছে চলে আসতে পারেন……

—বুবু বলে, আপনি তো গটগট করেই ঘরে ঢুকলেন শব্দ পেলাম তখন। তাহলে রাস্তা থেকে নিশ্চয় আপনাকে তারা বের করে দিয়েছে। আমাদের কাছে চলে আসুন, পা চালিয়ে চলে আসুন, ভয় কি আপনার।

তথাপি অন্য তরফ থেকে তেমন উৎসাহ উচ্ছ্বসিত হয় না। অমল বলে, সাহস পাচ্ছেন না? ঘর অন্ধকার বলে বুঝি? আচ্ছা, অত তাড়া কি, তাড়াহুড়ার কি দরকার, সকাল আর হতে কতক্ষণ? তখনি আপনার সুব্যবস্থা করা যাবে। এইটুকু সময় চোখ কান বুজে কোনো রকমে কাটিয়ে দিন।

বুবু অনুযোগ করে। —না-হয় মটকা মেরে পড়ে থাকুন ততক্ষণ।

অমল বলে, বড় লোকের কি দুর্দশা ছাখ। না বড়লোক হয়, না বস্তাবন্দী হতে হয়, না মুখ-বাঁধা হয়ে পড়ে থাকতে হয় অন্ধকার ঘরে ডাম্পো মাটির ওপর।

—হ্যাঁ, ভারি অসুবিধে। তুই যেন বড়লোক হোস নে। বুবু অমলকে সাবধান করতে চায়।

—দরকার কি হবার আমার। অমল জবাব ছায়। —আমার দাদা থাকলেই হোলো। আর চাইনে কিছু।

আলাপ-আলোচনার ফাঁকে-ফোকরে কখন ওদের চোখ জড়িয়ে আসে, ওরা ভূমিশয্যায় সুবিস্তৃত হয়। প্রথম ঘুম ভাঙে বুবুর, চোখ মেলেই সে হুটপাট করে ওঠে, ধাক্কা মারে অমলকে। —এই! এই অমলা! ব্লেক! ব্লেক!

—উঁ। উঁর বেশি নিজেকে উঁচু করে না, উঠতেও চায় না ব্লেক।

— কৃতান্তের কী হাল হয়েছে ছাখ!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমলকে উঠতে হয়, উঠেই সে চমকে যায়। —য়্যাঁ, এ কি! এ কে?

—কৃতান্তের আর দুটো পা গজিয়েছে ছাখ্।

—ভারি আশ্চর্য তো! কি করে এ হোলো?

—আবার একটা ল্যাজও।

—একি সেই ভদ্রলোক? আমার দারুণ সন্দেহ হচ্ছে। রাতারাতি আবার কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসল না তো?

—পাগল! নিশ্চয় সেই! সে ব্যতীত আর কে? আমাদের সঙ্গেই ঘরে পুরে দেওয়া হোলো। বুবু জোরের সঙ্গে জবাব দেয়, তাছাড়া মুখ বাঁধাই রয়েছে, দেখছিস না? সে না হয়ে যায়?

—তা বটে। তবে রাতারাতি চেহারা এমন বিচ্ছিরি বদলে যাবার মানে? রবার্ট ব্লেকের প্রশ্ন হয়। —তুমি এ সম্বন্ধে কি বলতে চাও মিস্টার স্মিথ?

—আমার মনে হয়···স্মিথ মুখখানাকে গুরুগম্ভীর করে আনে··· কৃতান্তচাঁদ ছদ্মবেশ ধারণ করেননি তো আমাদের মতন ?

—পাগল ! কৃতান্ত না, এ নিতান্তই গরু। অমল হাসতে থাকে। —বিশ্বাস না হয়, ল্যাজ টেনে দেখলেই পারিস্। ছদ্মল্যাজ হলে খুলে আসবে তো। পরচুলার মতন তোর হাতের মুঠোতেই এসে যাবে। অমল আরো যোগ করে। —আর যদি না-হয় ওর শিঙের কাছে গিয়েই ছাখ না। গুঁতো থেকেও একটা আইডিয়া পেতে পারিস্।

—কোনো দরকার নেই। বুবু বলে। —আসল গরু কিনা ওর ভাষা থেকেই বুঝতে পারব। গরুদের ল্যাংগোয়েজই আলাদা, চিনতে দেরী হয় না। দাঁড়া দেখছি।

বুবু গিয়ে মুখের বাঁধা খুলে দিতেই, সেই বিকল্প কৃতান্তচাঁদ, প্রাণ ভরে এতক্ষণ পরে এক ডাক ছাড়েন। —হাম্বা !

তবু সন্দেহ থেকে যায় বুবুর। —কি বলল ও। হাম হ্যায়। রাষ্ট্রভাষা করে বলল না ?

অমল বলে, উত্তম পুরুষে উত্তর দিল। গরুরাই সবসময়ে ফার্স্ট পার্সনে কথা বলে। দাদা বলে, ওটা গরুদের দস্তুর। সবটাতেই কেবল আমি আর আমি। অহঙ্কারের সীমা নেই ওদের। আবার বিনয়ের অবতার ওরাই নাকি ! দাদার মতে সেটাও ক ছদ্ম অহঙ্কার।

—'তোর দাদা যখন বলছে তখন ··বুবু এবার সিদ্ধান্ত করে ফ্যালে ···এ গরু না হয়ে যায় না ? তাহলে কৃতান্তর বদলে গরু কেন এখানে। ওরা কি ভুল করে কাকে আনতে কাকে এনে ফেলেছে বলে তোর মনে হয় ?

—দাদা বলে, গরুর রহস্য অনন্ত। প্রায় ব্রহ্মের মতই। অমল তার বক্তৃতার রেলগাড়ী চালিয়ে যায় : ব্রহ্ম ক্ষী, জানিস। অনেকটা ডিমের মতোই। ডিম দেখে কি ডিমের রহস্য বুঝতে পারিস্ ? কোনটা পচা কোনটা তাজা ? সেইজন্যেই বলে ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মের

ডিম অর্থাৎ কিনা ঘোড়ার ডিম। কেবল তফাৎ এই আসলে যেমন, ঘোড়া আছে ঘোড়ার ডিম নেই কিন্তু ব্রহ্মের বেলা, ঘোড়ার ডিমটাই রয়েছে, অথচ ঘোড়াই নেই। বুঝেছিস্?

'তোর দাদার কথা ভারি শক্ত। বুবু ঘাড় নাড়ে। —দিদিই বুঝবে কিনা কে জানে।

—থাক্‌গে ওসব। বলে ওঠে অমল। —এখন এই গরুর রহস্যটাই আগে ভেদ করা দরকার।

তারপর থেকে দুজনে মিলে ঘোরতর মাথা ঘামায়, মাঝে মাঝে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে, অমল নোটবুকে কি সব টুকে নেয়, আবার গুম হয়ে ভাবতে থাকে। এমনি করে সকাল থেকে বিকেল গড়িয়ে আসে। মাঝে মালিটা, দরজা খুলে দয়া করে খবরের কাগজ মুড়ে চারটি ভাত আর শাকের একটা ঘ্যাঁট ফেলে দিয়ে গেছে আর গরুটাকে এক আঁটি শুকনো বিচালি; তাই গলাধঃকরণের পর থেকে ওদের গাম্ভীর্য গুরুতর সীমায় উঠেছে। ওদের তিনজনেরই।

—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস্। অমল বলে ওঠে হঠাৎ। —আমরা যখন চুপচাপ থাকি, কিছু করে না গরুটা। কিন্তু কথা বললেই মাথা নাড়তে থাকে। কি রকম অদ্ভুত মাথা নাড়া, দেখেছিস্। ওই ছাখ আবার নাড়ছে।

—কারু কথা শুনলে মাথা চালা বোধহয় ওর ব্যায়রাম! বুবু বলে। —কিম্বা হয়তো মানুষে বকাবকি করে, এটা ওর পছন্দ নয়।

—তাই হবে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অমল। —সেই যে তখন এক ডাক ছেড়েছিল তারপর আর ডাকেনি তো! মৌনব্রত নিয়েছে যেন। গরুটার আধ্যাত্মিকতা আছে। দাদা বলে ওটা গরু মাত্রেরই থাকে।

—আধ্যাত্মিকতা। সে আবার কি? বুবু জিজ্ঞাসা করে? —দ্বিতীয় ভাগে তো পাইনি একথা!

—পাবি কি করে? দাদার বের করা যে! দ্বিতীয় ভাগ আবিষ্কারের অনেক অনেক পরে। অমল ব্যাখ্যা করে ছায়।

—আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে স্পিরিটের কি সব ব্যাপার। দাদার কাছেই জানিস বরং!

—আহা, তুই-ই বল না। বুবু ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

—স্পিরিট জিনিস তো। মেথিলেটেড? স্পিরিট হচ্ছে দেশলাইয়ের ওপর চটা, কাছাকাছি ঘষলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, একেবারে যেটে পড়ে কিনা কে জানে! আধ্যাত্মিকতাও তাই, আধ্যাত্মিক লোকদেব কাছে গিয়ে দেশেব কথা বলে ছাখ্ না। তক্ষুনি জ্বলতে শুরু করেছে। হযতো মাথায় ফাটিয়ে বসবে তোর।

—ও বাবা। বুবু ভীত হয়। -ভারী খারাপ তো?

—তা আব বলতে। স্টোভ জ্বালিয়ে ডিম ভাজা ছাড়া আব কোন কাজ হয় না স্পিবিটে। আধ্যাত্মিকতায় তাও হয় কিনা কে জানে!

এঁটো খববের কাগজেব একটা জায়গায অমলের চোখ পড়ে যায় হঠাৎ—সন্তর্পণে কাগজটা তুলে ধরে পড়বাব চেষ্টা করে সে। বড বড় হেড লাইন দেওযা:

COW'S LAUGHTER

—গরুব হাসি। দুজনেই বলে উঠে একসঙ্গে। —সে আবার কিবে?

—পড়েই দেখা যাক্।

A Special session or cow conference is shortly going to be held—

বুবু বাধা দেয় মাঝখানে। গরুবাও আজকাল সভাসমিতি করছে নাকি? আশ্চর্য তো!

অমল বলে, গরুবাই তো করে এসব। দাদা বলে···

দাদার কথা না-বলে খবরেব প্রতিই ও মনোযোগ দেয় আপাততঃ,

—going to be held at the residence of Mr. Kritantachand Lohia: a wealth Marwari merchant of devise ways and means for the prevention of the slaughter

of cows, of course, advise on this point will be very eagerly sought from the wise cow—

খবরটা এখানেই ছিঁড়ে গেছে।

—কৃতান্তচাঁদের বাড়ি। কিছু clue যেন পাওয়া যাচ্ছে। অমল লাফিয়ে ওঠে। —কিন্তু কাগজটা যে ছেঁড়া। যেখানে ছেঁড়া উচিত ছিল না ঠিক সেই খানটাতে ছিঁড়ে গেছে।

—Wise cow আবার কি রে ব্লেক?

—আহা, cow-রাই তো wise। গরুর চেয়ে আর জ্ঞানী কে? জ্ঞানী ছাড়া আবার গরু কে? অমল বলে, দেখি তোর এঁটে পাতাটা। ওটা তো বাংলা কাগজ, দেখি ওতে যদি কোনো সন্ধান পাওয়া যায় আরো।

তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজির ফলে এই সংবাদটা বেরোয়:

—কৃতান্তচাঁদ লোহিয়া কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মারোয়াড়ী। তিনি সম্প্রতি নেপাল ভ্রমণে গিয়া উহার পার্বত্য অঞ্চলে এক মহর্ষি এবং এক গরুর দর্শন লাভ করেন। গাভীটির অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সে নাকি মুনি-ঋষিদের মতো ত্রিকালজ্ঞ—ভূত ভবিষ্যত বর্তমান সমস্তই বলিতে পারে। অবশ্য মুখে কিছু বলে না, মাথা নাড়িয়া জানায়। যে কোনো বিষয়েই হউক না, প্রশ্ন করিলেই আপনি তাহার সদুত্তর পাইবেন। কৃতান্তচাঁদ নানা স্তবস্তুতি ও সেবার দ্বারা মুনিবরকে সন্তুষ্ট করিয়া এই গাভিটি বর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন আগামী ঘোড় দৌড়ের সময়ে এই গাভীকে কাজে লাগাইবেন। ইহার সাহায্যে কোন্ রেসে কোন্ ঘোড়া জিতিবে আগেই জানিয়া লইয়া বাজি জিতিবার তাঁহার সংকল্প। বলাবাহুল্য, ইহার ফলে লক্ষপতি কৃতান্তচাঁদ অচিরেই নিযুতপতি হইবেন। জলেই জল বাধে, সৌভাগ্যলাভ হয় ইহা কে না জানে?

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই গরুটিকে কৃতান্তচাঁদ

তাঁহার শয়নকক্ষের পাশেই অট্টালিকার পঞ্চম তলে উপযুক্ত প্রহরাদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়াছেন। ইতিমধ্যেই কে বা কাহারা কৃতান্তচাঁদকে শাসাইয়া চিঠি দিয়াছে যে তিনি যদি অবিলম্বে একলক্ষ মুদ্রা দুর্বৃত্তদের দিতে প্রস্তুত না থাকেন তাহা হইলে তাহারা যে কোনো উপায়েই হোক তাঁহার গরুটিকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবেই যাইবে। কৃতান্তচাঁদ প্রহরীর সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং সতর্ক রহিয়াছেন।

—এখন তো বুঝতে পারলি সব? অমল বলে।

—হুঁ। বুবু মাথা নাড়ে।

—কৃতান্তচাঁদের জায়গায় এই গরুকে বসিয়ে দিলেই সব ঠিকঠাক মিলে যাবে এখন।

—বেচারা কৃতান্তচাঁদ! গরু হারা হয়ে এতক্ষণ হাহাকার করছে হয়তো।

—ঠিক যেমন করছে তোর বাবা! অমল বলে।

—আর তোর দাদা! বুবু যোগ করে দ্যায়। —আমি একাই বুঝি গরু হবো? বারে!

—আমার দাদা কথাশিল্পী, কারু জন্যই হাহাকার করে না। কি বলে জানিস তো? বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, আমি একা বসে রব কথাশিল্প দিতে।

—বিশ্বটা কি রে? আমাদের পাড়ার বিশু নাকি, যে গোলে খ্যালে?

—উহুঁ! কোনো সম্পাদক-টম্পাদক হবে বোধ হয়।

—তোর দাদার লেখা পড়ে সম্পাদকরা সব বুঝি কেঁদে ফ্যালে?

—কাঁদতেই হবে। কি রকম লেখা এক একখান! বুক ফুলিয়ে বলে অমল।

তারপর তারা গরুর সমস্যায় ফিরে আসে ফের। —এখন তো বুঝছিস যে সেই গোদালোটাই যত নষ্টের গোড়া। কৃতান্তচাঁদ তো প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়েছেন, সে এদিকে তাদের ঘুমের আরক খাইয়ে

নিজের কাজ হাসিল করেছে। একবার এখান থেকে বেরুতে পারলে হয়। তারপর দেখি একবার সে ব্যাটাকে! আকাশের গায়ে ঘুসি মারে অমল।

—একটা কিন্তু খটকা লাগছে আমার। বুবু নিজের কপালে রেখাপাত করে। —cow's laughter কী ব্যাপার বুঝলুম না তো?

—ঐ যে, খবরটাতে লিখে দিয়েছে তো। cow slaughter বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা। গরুরা সব হাসছে সেইজন্যে।

—হাসছে কেন?

—শ্লটারকে ওরা থোড়াই কেয়ার করে, মারা যেতে মোটেই ভয় খায় না ওরা!

—ভয় না থাক, কিন্তু মারা যাওয়াটা কি হাসির ব্যাপার হোলো?

—হ্যাঁ, গরুদের কাছে অদ্ভুত। অমল বিজ্ঞের মত বলে, ভয়ানক হাসির বইকি! তুই আমি মারা গেলে হয়ত কেঁদেই ফেলব। ওরা কিন্তু তা নয়। হাসতে হাসতেই প্রাণ দেয় গরুরা। গরুরাই পারে।

তার পরের পরের দিন প্রাতঃকালে অমল আর বুবুকে লোহিয়া প্রাসাদের দরজায় ব্যতিব্যস্তরূপে দেখতে পাওয়া যায়। দারোয়ানও ওদের যেতে দেবে না, ওরাও ছাড়বে না কিছুতেই। এই মুহূর্তেই কৃতান্তচাঁদের সঙ্গে দেখা করা ওদের চাই-ই, একেবারে নাছোড়বান্দা।

দারোয়ান ওদের বোঝায়। —আবি ভিতরমে গৌ-সভা হোতা, বাহারকা আদমি যানেকো মানা হ্যায়।

বুবু বলে গরুদের মিটিং কিনা, তাই মানুষের 'প্রবেশ নিষেধ।'

অমল ঘাড় নাড়ে। বুঝেচি। সেই কাউ-কনফারেন্স। তারপর দারোয়ানের দিকে ফেরে। হোম বুঝতে পারতা। কিন্তু গরু সে তো হামকো কাজ নেই, হামারা দরকার কৃতান্তবাবুকে।

—মালিকভি উ সভামেই বৈঠল বা। দারোয়ান খেনি ডলায় সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে।

—হামভি আতা হ্যায় এক গরুকা তরফমে। অমল এবার মারয়া হয়ে ওঠে। —নেপালকা গরু। বহুৎ জরুরি কাম কিনা, আভি দরকার; জানতা হ্যায়।

—ও! সমঝ্ লিয়া। গৌ সভাকো কামমে? দারোয়ান এবার উদ্ব্যস্ত হয়ে ওঠে। —উ তো পয়লা বোলনা চাহিয়ে। আইয়ে ভিতর।

তৎক্ষণাৎ সভাস্থলে ওদের নিয়ে গিয়ে সভাপতির মঞ্চের কাছাকাছি দুটো চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয়।

অমল বুবুর কানে ফিস্‌ফিস্ করে। —এদের মধ্যে কে যে কৃতান্ত জিজ্ঞাসা করা হোল না ত?

—জেনে নিলে কতক্ষণ? সভার হাঙ্গামাটা শেষ হোক না, তারপর পাকড়ালেই হবে কৃতান্তকে।

সভার চারধারে তাকিয়ে দেখে ওরা। দুজনেই ভারি বিস্মিত হয়—এ কি! গরু কোথায়? সবই তো মানুষ দেখচি। চারদিকেই তো মানুষ!

একটাও গরু নেই, অথচ কাউ-কনফারেন্স! অসন্তোষ চেপে রাখা কঠিন হয় বুবুর পক্ষে।

খবরের কাগজের সব কথাই মিথ্যে। অমল বলে। —কেবল ধাপ্পা।

—তোমরা কোন কাগজ থেকে আসচ ভাই? পাশের একজন লোক অমলকে জিগ্যেস করে।

ওদের চেয়ে বয়সে খুব বেশি নয়। কিন্তু তার ভাবভঙ্গি থেকে তাকে ভদ্রলোক না-বলা ভারী শক্ত। কিছুতেই ভদ্র বালক বলা যায় না। যদিও তার দাড়ি উঠেছে কিনা সন্দেহ। অমল চোখ তুলে তাকায়। —কি বললেন?

—তোমরা কি কোনো খবরের কাগজ থেকে আসচ? আবার প্রশ্ন হয়।

অমল একটু ঘাবড়েই যায়। কী জবাব দেবে খুঁজে পায় না। যে কাগজগুলোতে এ-কদিন তাদের খাওয়া-দাওয়া চলেছে তাদের নাম করে দেবে কিনা একবার ভাবে। বুবু জবাব দ্যায়। —না তো?

অমল জিজ্ঞাসা করে, আপনি?

—আমি আসছি 'হট্টগোল' থেকে। আমি একজন জার্ণালিষ্ট। পড়েচ নিশ্চয় 'হট্টগোল?'

—খুব। বুবু উৎসাহ প্রকাশ করে। —ওতে বসে খেলাম পর্যন্ত! বেশ টেকসই কাগজ! ছেঁড়ে না সহজে।

—হুঁ! খুব চলতি কাগজখানা। আপ্যায়িত হয়েই উত্তর দেন ভদ্রলোক—বা, সেই ভদ্র বালক।

—আপনি কি, কি বললেন—আপনি? ভদ্রলোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেতে চায় অমল।

—জার্ণালিস্ট। ওর মানে হচ্ছে, যার-না-লিস্ট। কোনো তালিকাতেই যিনি নেই, অথচ এমনি লীলা সব তালিকাতেই তিনি আছেন। সব রকম তালে। গোল আলু যেমন—ঝালে, ঝোলে, অম্বলে, ভাজায়, ভাতে—ঠিক তেমনি আর কি!

—ওঃ! সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বুবু।

—আচ্ছা, এসব লোক কারা মশাই? সবাই কি ঐ যে বললেন—? কিন্তু এইমাত্রই কথাটা সে ভুলে যায়, অগত্যা বাংলা করেই বলে, সবই কি গোল আলু?

—না না, গোল আলু কেন হবে! অমলের কথায় জবাব দ্যান, তিনি। —সব গোল আলু না! এর মধ্যে রাজা, মহারাজা, উকিল, ব্যারিস্টার, প্রোফেসর, ইস্কুল মাস্টার, ডাক্তার, মোক্তার, বড় লোক, মাঝারি লোক, ছোট লোক সকলে আছেন।

—মারোয়াড়ীও আছে, আবার বাঙালীও রয়েছে অনেক। বুবু

তালিকাটা সুসম্পূর্ণ করে ছায়।

—কিন্তু গরু কই? অনেকক্ষণ থেকেই সন্দেহ-ভঞ্জনের প্রয়োজন অনুভব করেছে অমল। —গরু কই এর মধ্যে? শুনলাম এটা একটা কাউ-কনফারেন্স।

—কেন? এ সবই তো গরু? সহজ সুরেই ভদ্রলোকের উত্তর আসে।

—গরু! দুজনেই হতবাক হয় বিস্ময়ে! —সব্বাই?

—গরু ছাড়া আর কী! নিজের নিঃসয়তার জোরে ওদের নিশ্চিন্ত করতে চান তিনি। পরিচয় পেতে দেরি লাগবে না তোমাদের।

—আশ্চর্য! অমলের কানে কানে বলে বুবু! তার কণ্ঠস্বর, কমলাকান্ত এবং পৃথিবীর মতোই উত্তর-দক্ষিণে চাপা। —কিন্তু কি করে যে এরা ফিফটি পারসেন্ট পা আর সেন্ট পারসেন্ট ভয়েস চেপে রেখেছে আমি তাই ভাবছি।

—Voice চাপলে কি হবে—mood-এ-ই ধরা পড়ে যাবে। অমলের উত্তর হয়। —দাদা কি বলে জানিস? গরুদের ঐ একটাই mood—ইণ্ডিকেটিভ মুড। ইম্পারেটিভ, ইণ্টারোগেটিভ এ সব ওদের নেই।

—কিন্তু পা চাপল কি করে?

—পায়ের কথা আর বলিস না। ও আর এমন শক্ত কি? পাশের এই বিচ্ছিরি লোকটাকেই ছাখ না, কেমন করে আমায় থারটি পারসেন্ট পা চেপে বসে আসে। বুবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অমল। —এমন লাগছে আমার—কি বলব।

—খুব কষে এক চিমটি কাট না। বিপন্ন বন্ধুর প্রতি বুবু সহানুভূতি সুলভ ব্যবস্থাপত্র বাতলায়। এবং অমলের হয়ে নিজেই একটা চিমটি কেটে ছায় সঙ্গে সঙ্গে!

—উঃ, কী ছারপোকারে এ-জায়গাটায়। বাপ্। এই কথা

বলে পরমুহূর্তেই পাশের লোকটা অমলের প্রতিবেশিত্ব পরিত্যাগ করে।

—বুবু, কী কাণ্ড করেই না পালিয়েছি আমরা! সকালের কথা অমলের মনে পড়ে যায়। —গরুটা ঐ রকম কায়দা না করলে কি ছাড়া পেতাম আজ?

—মা কি বলেন জানিস? গুরুর কৃপা ছাড়া মুক্তি হয় না। বুবু সমালোচকদের পদে নিজেকে অভিষিক্ত করে। —কিন্তু মার কথা ভুল। ওটা গরুর কৃপা।

—কেন দাদার ব্যাখ্যা তোকে বলিনি? গুরু আর গরু যে একই বস্তু রে! একাধারে দুই, দুই আধারে এক—আলাদা কি? উঁহু। আবার ভেবে ছাখ, গরুর খাদ্য হোলো শস্য আর গুরুর খাদ্য হোলো শিষ্য। তারাও কিছু কিছু আলাদা নয়।

বাস্তবিক, গবর্ষির সহযোগীতা ছাড়া এত শীঘ্র এবং সহজে ওদের মুক্তি হোতো কিনা সন্দেহ। গবর্ষি নামকরণ হচ্ছে বুবুর, গো ছিল ঋষি ইতি গবর্ষি। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায়, নেপালের পার্বত্য অঞ্চলে, গহণ জঙ্গলের মধ্যে, এই মহাপ্রাণীটি কোনো ঋষিবরের আশ্রমেই নাকি ছিলেন। বুবুর মতে, অতএব ও ঋষিই বটে। জমিদারের দেউরিতে যে থাকে সে যেমন জমাদার—প্রায় জমিদারের সমান সমান, তাই নয় কি? আওয়াজের এবং আধিপত্যের কিছু কি 'তাফত্য' আছে ওদের মধ্যে? তাই থেকেই, জোর করে জাহির করেছে বুবু —গরু নয়, ও গবর্ষিই। অমলও মেনে নিয়েছে মতটা।

আজ ভোর হতে না-হতেই, উক্ত চতুষ্পদ ব্যক্তিটি এমন চেঁচামেচি শুরু করেছিল, বিচালি নিয়ে ছুটে আসতে হোলো মালিকে, খিদের জন্যেই এত হাঁকডাক তার হোলো আন্দাজ। কিন্তু কদিন ধরে কেবল বিচালি খেয়ে খেয়ে মনে মনে ভারি চটে ছিলেন গবর্ষি। দরজা খুলে মালির প্রাদুর্ভাব হতেই, কথাবার্তা নেই, তাকে গুঁতোতে সুরু করে দিলেন। গরুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব সমাসে কেবল বামুনরাই পারে, গো

ব্রাহ্মণ হিতায় চ বলে নাক কথায় আছে। কিন্তু বেচারা ন্যাজ পেরে উঠবে কেন? অল্পক্ষণেই সে কাত হয়ে পড়েছে। অমল আর বুবু, সেই সুবর্ণ সুযোগেই, দরজা ফাঁক পেয়ে, বে-তালা গেট পেরিয়ে বাগান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। পরমুহূর্তেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে ধাবমান কলিকাতাগামী একটা প্যাসেঞ্জার বাস-এ ওদের উৎক্ষিপ্ত হতে দেখা গেছে।

—আচ্ছা কাউস্ লাফটারটা কী মশাই? আলুটিকে প্রশ্ন করে বুবু। —গরুতে আবার হাসে নাকি?

—হাসে বইকি! তিনি উত্তর দ্যান। —হাসে, গান গায়, বক্তৃতা দ্যায়। আবার বইও লেখে এক এক সময়, বেশির ভাগই ইস্কুলপাঠ্য। গরু তিন প্রকার laughing cows, coughing cows আব bluffing cows, অর্থাৎ কিনা হাস্যকর গরু···

বুবুও একটার অনুবাদ করে দেয়, অযাচিতই। —কাস্যকর গরু।

—এবং bluffing cows। ওর মানে হবে—এই কি বলে গিয়ে ভাষ্যকর গরু! গোল আলু ব্যক্ত করেন।

ইতিমধ্যে সভামঞ্চে, বেশ হৃষ্টপুষ্ট এক ব্যক্তি, সোজা হয়ে ওঠেন।

—শোনো, শোনো! আমাদের একজন নেতা উঠেচেন। বক্তৃতা করবেন। গোল আলু বলেন।

—নেতা কি মশাই? বুবু জানতে চায়।

—নেতা জানো না? নেতা বলতে পারো, আবার ন্যাতাও বলতে পারো! ন্যাতা যা বুলায়, এইবাব বুঝলে?

—না তো!

—উনি একজন দেশনেতা। দেশের উপর বুলান; পা খুব কমই, নামমাত্রই, না-বললেই চলে, হাতই বেশি। কখনো দেশের মাথায়, কখনো পিঠে, কখনো বা পকেটে

—আমি কেবল দু-একজন অভিনেতার নাম শুনেছি। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলে বুবু।

—ও দুই একই। নেতা আর অভিনেতা। ভদ্রলোক বিশদ করে দ্যান। —ময়দানে হলেই নেতা, আর থিয়েটারে হলেই অভিনেতা—!

বলতে না-বলতে দেশনেতা বেশ হাত পা নেড়েই শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতার সারমর্ম এই: দেশের আজ ঘোরতর দুর্দিন। আমাদের চতুর্দশ পুরুষের সৌভাগ্যের বলে, যে মহাপুরুষ সামান্য গরুর কলেবর নিয়ে, আমাদের যাবতীয় দুঃখ দূর করবার জন্যে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্যে যাঁর লাঙ্গুলের ছায়ায় আজ আমরা সমবেত হতে চেয়েছিলাম, তিনি আজ অন্তর্হিত। দুর্বৃত্ত দশাননরা তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেছে, হায়, কোথায় সেই হনুমান,—সেই মহাবীর, যে তাঁকে উদ্ধার করে আনবে?···

—এই যে আমরা আছি। চাবধার থেকে সোবগোল উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে করতালি পড়ে যায়।

—না:, আপনারা নন, এই কৃতান্তচাঁদই সেই হনুমান। রামের অবর্তমানে রামরাজ্যে—রামরাজ্যে····ভদ্রলোকেব তোড় যায় আটকে—

···রামরাজ্যে কী হয়েছিল হ্যা?

একজন ধরিয়ে দ্যায়। —হাহাকার পড়ে গেছল!

—উহুঁ, হাহাকার না। বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করেন মহাবক্তা। —রামের অভাবে রামরাজ্য হয়েছিল কি?

এবার বুবুর দুঃসাহস হয়। —ব্যয় রাম!

—তোমার মাথা। রামচন্দ্রের অবর্তমানে রামরাজ্য যেমন ভরতচন্দ্র শাসন করেছিলেন, তেমনি আমাদের এই পূণ্যশ্লোক গবচন্দ্রের অবর্তমানে, তাঁর সভাপতির শূন্য আসনে আমরা অভিষিক্ত করি তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য এবং সেবায়েত শ্রীমান কৃতান্তচন্দ্রকে!

আবার জোর হাততালি! এবার কৃতান্তচাঁদ ওঠেন। অমল জিজ্ঞাসা করে। এ কে?

—এই তো কৃতান্তচাঁদ! অঢেল টাকা! গোল আলু জানিয়ে দ্যান। —গরুর কৃপাতেই সব—!

—য়্যাঁ! এই নাকি! আকস্মিক ধাক্কা সামলানো শক্ত হয় অমল আর বুবুর। —এ যে সেই গোদালো লোকটারে—! বিস্ময়ের আতিশয্যে ওরা নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

কৃতান্তচাঁদের বক্তৃতা শুরু হয় খুব বিনীতভাবে: হাসি গৌমুণিকা সিংহাসনে বৈঠবার লায়েক না। দুষমন লোক উসকো পাকড়ে লিয়েসে। লেকিন হামভি দুষমনকা পাশ হামার আদমি ভেজেসে। লাখ রুপিয়া ভি দেনেমে তৈয়ার আসে। এই হামারা চেকবুক, হামারা হাতমে। হামি বোলে যে, উসমে কেয়া হরকৎ? লাখো রুপিয়া তো? ও থোড়েই হ্যায়। হাম আভি দেঙ্গে। গৌমুণ রহনসে হামারা কেৎনা ক্রোড়ো রুপেয়া আ যায়গা। লেকিন আগারি রেসকা টাইম তো আনে দেও। আপলোককো বহুৎ ঘড়ি ঠাওরাতে হোবে না, হামরা আদমি গেসে, আভি গৌমুণিকে লিয়ে চোলে আসসে।...

শ্রোতাদের মধ্যে ভয়ানক হইচই হয়। কৃতান্তের কথায় সমস্ত সভায় উৎসাহের সাড়া পড়ে যায়। অকস্মাৎ বাহির থেকে বিপুল জয়ধ্বনি আসতে থাকে। ক্রমশই এগিয়ে আসে। অমল আর বুবু তাকিয়ে দ্যাখে, এক নম্বর আর দু'নম্বর একদা কৃতান্তচাঁদের সেই ঘরে দেখেছিল, তারাই আসছে, আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই গবর্ষি!

—গৌমুণি আগয়ি, গৌমুণি আগয়ি! কৃতান্তচাঁদ লাফাতে শুরু করে দ্যান। গোদা পায়েই লাফাতে থাকেন।

সভার লোক সবাই দাঁড়িয়ে ওঠে, কেউ কেউ দণ্ডবৎ হয়ে গবর্ষির চার পায়ের ধুলো নেয়। সকলের কণ্ঠেই জয় নিনাদ! —জয় জয় গৌমুণির জয়! গবর্ষি সবাইকেই ল্যাজ তুলে প্রতি নমস্কার জানায়।

গুণ্ডা দুটো এসে বসে অমলের পাশেই। একটু আগে আরাম-

প্রিয়তার পক্ষপাতী পা-চাপানো সেই ভদ্রলোক যেখানে বসেছিল, তার পরিত্যক্ত সেই আসনে। চেকবই খুলে প্রতিশ্রুতি রাখতে প্রস্তুত হয় কৃতান্তচাঁদ। —কেয়া নাম আপলোগেকো? তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ নামসে হাম চেক কাটবে?

এক নম্বর দু'নম্বরকে ঠেলে দেয় দু' নম্বর এক নম্বরকে। পরস্পরের নাম জানতে চায় ওরা।

—ভারি হাঙ্গামা করলে তো ব্যাটা। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে। নাম বলে কি ফ্যাসাদে পড়ব শেষে? এখন কি করা যায় বলতো? একটা নাম তো বলতে হবে।

—কই, কিছু তো ছাই মনে আসছে না আমার! দু'নম্বর ম'থা চুলকোতে থাকে।

—অন্য নামটাম যাহোক একটা মনে কর না চটপট!

—নিজের নাম দূরে থাক, বাপের নামই ভুলিয়ে দিচ্ছে—বলব কি?

—তাই তো ভারি মুশকিল হোলো! কিন্তু মরুভূমির পাশেই এক নম্বর যেন ওয়েসিস দেখতে পায় হঠাৎ। —এই তোমাদের নাম কি রে?

—অমল আর বুবু। জিজ্ঞাসিত হয়ে অমল জবাব দেয়।

তখন এক নম্বর দাঁড়িয়ে উঠে ঘাড় মাথা চুলকে, লজ্জায় আরক্ত হয়ে নিজেদের নাম ঘোষণা করে।

—পে টু অমল এ্যাণ্ড বুবু। কৃতান্তচাঁদ চেকে নামসই করেন।

—রুপিজ ওয়ান লাখ। বেয়ারার চেক কিয়া, ক্রস ভি নেহি কিয়া! হাম যব দেতা হ্যায় এই সা দেতা হ্যায়!

কৃতান্তচাঁদ থেকে হাতাহাতি হয়ে চেকটা যথাস্থানে পৌঁছে যায়। চারিদিকেই ধন্য ধন্য রব ওঠে। এই মহান দানশীলতার সমারোহে সকলেই দাতাকে সাধুবাদ দিতে থাকে। বেজায় বাহবা পড়ে যায়।

এক নম্বর অমলের পিঠ চাপড়ে দেয়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা

বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে ও পায় না। চেকটা গুঁজে দেয় ওর হাতে —এই নে! খেলা করিস তোরা।

কত আর অবাক হবে অমল? বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কা। তবু সে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে! লাখটাকার চেক ওর পকেটে! খুব সুবিধের কথা নয় তো।

এরপর সকলে গবর্ষির অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেতে চায়। যার যা প্রশ্ন, যা যা সমস্যা, একে একে উত্থাপিত হতে থাকে। সেগুলো কৃতান্তর ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে গবর্ষির কানের কাছে পুনরুক্ত হয়। গবর্ষি অমনি মাথা নাড়েন। যতবার মাথা নাড়ে, গুণে, যদি ছোড় হয় তাহলে 'হ্যাঁ', আর যদি বিজোড় হয় তবে 'না'—এই হোলো জবাব পদ্ধতি।

আশ্চর্য! উত্তরও সব ঠিক মিলে যেতে থাকে। এবার অবাক হন স্বয়ং গোল আলু। —ত্রিকালজ্ঞ গরু দেখছি! ক্যাঁ! এ বলে কি?

—গরুই তো ত্রিকালজ্ঞ, মশাই! সমর্থন করে! —কেন নয় বলুন? ত্রিকল-অজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ, তাই তো? ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সম্বন্ধে গরুর মতো এমন অজ্ঞ আর কে?

হঠাৎ অমলের খেয়াল হয়, সে দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করে বসে।

—আমি কি বড়লোক হবো কখনো? খুব বড়োলোক? কোনদিন হবো কি? যদি হই তো কবে? খুব তাড়াতাড়ি হওয়া যায় না?

একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নাঘাত। গবর্ষির মাথায় তুমুল আন্দোলন লেগে যায়। উক্ত শিং নড়ার অনুবাদ করে দ্যা কৃতান্তচাঁদ। —তুম লাখপতি হোবে।

—আচ্ছা, আউর একঠো। হামার দাদার কী সাদি হোয়েসে? অমল এবার গুরুর প্রশ্নপত্র গরুর সম্মুখে আনে দস্তুর পরীক্ষা করতে চায় গবর্ষিকে।

জবাব আসে। —হোয়েসে।

—হোলো না, মিলল না। বিয়েই করেনি আমার দাদা। চেঁচিয়ে বলে অমল। —কথাশিল্পীরা কি আবার বিয়ে করে? ধ্যাৎ।

কৃতান্তচাঁদ কিন্তু দমবার পাত্র না—তিনি আরো চেঁচাল। —তুস কেআ বখৎ কোঠিকে নিকলা জী? যাকে দেখো এতনা বখৎ হোয়ে গেসে। জরুর সাদি হোয়েসে। গৌমুণি কভি ঝুট বোলে না।

সভার সকলেই গৌমুণির পক্ষ নেয়, যাও হে, ছোকরা বাড়ি গিয়ে দ্যাখো গে, এতক্ষণ তোমার বউদি মাছের ঝোল চাপিয়েছেন উনুনে। বাজে ধাপ্পা ঝেড়ো না এখানে বুঝলে?

ভোটে হেরে গিয়ে মনমরা হয়ে পড়ে অমল। বুবুও।

অতঃপর দেশনেতার দিক থেকে প্রস্তাব হয়: এই দেবগাভীর সুবিধা একজনের ভোগা করা উচিত নয়। দেশের আজ ঘোরতর দুর্দিন—ইত্যাদি! গৌমুণির কৃপালব্ধ বিপুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার একজনের হতে পারে না, এর অধিকার সমস্ত দেশের, সকলের। দেশের এই দুর্দিনের কারণ কি? দারিদ্র? দারিদ্র কার? তোমার আমার, যাবতীয় লোকের এই দারিদ্র্য দূর হয় কেবল টাকা পেলেই। কিন্তু টাকা আসবে কোত্থেকে? কাঁচা টাকা—করকরে টাকা? ঐ রেস থেকেই। অতএব ঘোড়াই টাকা নেবার মালিক (অবশ্য ওড়াবার মালিক পাঠারাই বটে)। সেই ঘোড়দৌড়ের অতি নিগূঢ় কুট রহস্য ভেদ হবে কার দৌলতে? এই গৌমুণির কৃপায়। অতএব এই গৌমুণিকে নিয়ে এক ন্যাশনাল ট্রাস্টি করা হোক, আমি হই তার ট্রাস্টি —কৃতান্তচাঁদকে অনেক বলে কয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে আসি রাজি করেছি। নামমাত্র মূল্যে মাত্র আড়াইলাখ টাকা পেলেই, উনি গৌমুণিকে জাতির হাতে সম্প্রদান করতে প্রস্তুত আছেন।...

তৎক্ষণাৎ সেই সভাস্থলেই চাঁদা উঠতে থাকে। মারোয়াড়ীরা লম্বা লম্বা চেক কেটে ছায়। রাজা-মহারাজারা মুক্ত হস্ত হন। সাহেব সুবোরাও বদান্য হয়ে ওঠে। বাঙালী কোরনীরাও কার্পণ্য করে না। ইতর ভদ্র সকলেই হাত ঝেড়ে ছায়—অ্যারিস্টোক্রেট

ব্যারিস্টোক্র্যাটদের তো কথাই নেই। আড়াই লাখ টাকা উঠতে লাগে মোট আড়াই মিনিট।

তারপর সভাভঙ্গ। গবর্ষিকে পুরোভাগে নিয়ে বিরাট এক শোভাযাত্রা বেরয়। রাজা-মহারাজার, উকিল-ব্যারিস্টারের, প্রফেসার-মাস্টারের, ডাক্তার-মোক্তারের, বড়লোক-মেজলোক-ছোটলোকের সারবন্দী প্রশেসন। গোল আলুও যায় পেছনে পেছনে। সে এক দৃশ্যই বটে।

কেবল অমল আর বুবু তাতে যোগ দেয় না। —কত বড় একটা গবাযাত্রা দেখেছিস? অমল বলে। —একটা গরু, দুটো গরু—শত শত গরু।

—গৌ-গাবৌ-গাবঃ। অমলের সমর্থনে, ব্যাকরণ কৌমুদীকে এবার ঝালিয়ে নিতে হয় বুবুর।

এক নম্বর ও দু' নম্বরকে নিয়ে কৃতান্তচাঁদ সভাস্থল থেকে মন্ত্রণা কক্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন দেখতে পেয়ে অমল আর বুবু সবেগে বহির্গত হয়। আগে থেকেই সেই রোয়াক ডিঙিয়ে খোলা জানালায় সুযোগ নিয়ে, দেরাজের পেছনে গিয়ে বিরাজ করে। তার ঠিক পরমুহূর্তেই সেখানে তিন-মূর্তির আবির্ভাব।

—চেক লেগা? কৃতান্তচাঁদ জিজ্ঞাসা করে।

—নেহি, চেক নেহি। তারা বলে, কেশ দিজিয়ে।

—উঁ ফেক কেয়া কিয়া?

—ফেক দিয়া। তৎক্ষণাৎ ভ্রম সংশোধন করে নেয় এক নম্বর।

—নেহি, চেক নেহি দিয়া। খেলনে দিয়া বাচ্চা লোগকো।

—যানে দেও। কৃতান্তচাঁদ মুক্তহস্ত হন। —এই, 'তুম লেও দোহাজার, আউর তুম লেও দোহাজার। হুয়া তো? দুটো তোড়া ফেলে দ্যান তিনি।

পুলকিত হস্তে ওরা সোলাম কমে। লেকিন একঠো পুছনা হায়।

দু' নম্বর বলে, এই যা গরু কভে নাহি দেখা! তাজুবকা বাৎ! নেপালকা—সাচ হ্যায়?

—নেহি, নেহি—নেপালকা নেহি, নেপাল কভি নেহি গিয়া হাম। হুগলিকা উধার হরিপাল হায়, জানতা?

হরিপালকা গরু। তুদ উদ কুছ নেহি দেতা—কুছ কামকা নেহি, খালি শির হিলানা উসকা কাম। উ ভাগা, হামারা লছমী ভি আয়া। কৃতান্তচাঁদের বত্রিশপাটি দন্ত একসঙ্গে বিকশিত হয়। তুম লোক লিয়া চাব হাজার, লীডর বাগায় দোহাজার, এক হাজার গিয়া পাবলিসিটিমে, আউর মহাজনকো দেনা পড়েগা পাঁচ হাজার। তবভি হামরা নাফা রহা দোলাখ বিয়াল্লিশ হাজাব। কল হাম দেশ চলা যাগা। আউব. হিঁয়া নেহি! আউব কাহে কো?

—দেশ চলা যাংগে? এক নম্বব ও দু' নম্বব দুজনেই অবাক হয়। —আপকা এ কোঠিকা কেয়া হোগা?

—এ কোঠিভি হামারা নেহি। মহাজনসে কেরায়া লিয়া। এক কম্বল লেকে আয়া। হরিপাল মিলাযা। গরুসে আমদানি কিয়া—আভি ঘর চলনা হ্যায়।

কৃতান্তচাঁদের অট্টহাসির আকর্ণ বিস্তাব কমতে চায় না।

বাইরে এসে বুবু হাঁফ ছাড়ে। —দেখলি। লোকটাকে একেবারে রাজা করে দিলে সামান্য গরুতে! দেখলি তো?

—একটায়, না অনেকগুলো মিলে?

—যাই হোক! বুবু বলে।

—আর ওদের মধ্যে সামান্য আবার কে? সবাই তো অসামান্য গরু।

—যাই হোক! বুবুর পাকা পাকা কথার কোনো নড়চড় নেই!

রাস্তার একধারে সরে গিয়ে বুবুর কানে কানে বলে অমল, গরুদের

কথা ভারি সত্য হয়। ফলে যায় ভারি। জানিস, আমাকে তো বলেছে যে খুব বড়লোক হব? লক্ষপতি হব, তাই না? এই দ্যাখ!

চেকখানাকে পকেট থেকে সে বহিষ্কৃত করে।

—কে দিল তোকে? বুবুর চোখ বড় হয়ে ওঠে। —কোথায় পেলি?

—গবর্ষির কৃপায়!

—সত্যি!

—সত্যি না তো কি। যেমনি না গবর্ষির বলা, অমনি আকাশ থেকে পড়ল—একেবারে আমার পকেটের মধ্যেই।

—হা-হা! আকাশ থেকে পড়ল না ছাই! আমি বুঝি আর দেখিনি? এই তো কৃতান্তচাঁদের সই করা রয়েছে! সেই এক নম্বরকে তখনি লিখে দিলে না চেকখানা? কিন্তু আমাদের নাম এল কি করে এতে?

—সেই তো। গবর্ষির কীর্তি। ভঙ্গিতে ভারিক্কি হয়ে ওঠে অমল। —কীর্তি বল আর মহাত্মই বল। মহিমাও বলতে পারিস।

—চল, চেকখানা ভাঙ্গিয়ে আনি। বুবু শুধোয়। —ভাঙ্গাতে জানিস তো?

—কত. অমল বলে দেয় অবহেলায়—দাদাব কত চেক ভাঙিয়ে আনি ব্যাঙ্ক থেকে। আমিই তো আনি, আর কে আনবে? এমন শক্ত কি আর। কেবল বানান মিলিয়ে এর পিঠে একটা সই করা বইতো নয়।

অতুল ঐশ্বর্যের আসন্নতায় ভারাক্রান্ত, অমল আর বুবু ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হয়।

ব্যাঙ্কের লেজার কিপার কিন্তু চেকখানা নিয়ে ফেরত দেয়। —এত টাকাই নেই কৃতান্তচাঁদের। লাখ টাকার চেক কেটেছেন, পাঁচশো টাকাই আছে কিনা সন্দেহ!

—বলেন কি মশাই। আপনি ভালো করে দেখুন তো? অমল বলে, মস্ত বড়লোক যে লোকটা!

এবার ভালো করে দেখেই কর্মচারিটি বলেন, হতে পারেন বড়লোক! কিন্তু আমাদের ব্যাঙ্কে বেশি টাকা রাখেননি। মোটে পাঁচ হাজার টাকার একাউন্ট খুলেছিলেন, আর পাঁচ শো টাকাই কেবল পড়ে আছে। ঠিকই বলেছি।

—তাহলে আর কি হবে! অমল বলে, চলে যাই চল। এটা উপহার, বাঁধিয়ে রাখব না হয়। তোর আসচে জন্মদিনে উপহার দেব তোকে। লাখ টাকার চেক। পেলে তুই খুশিই হবি।

—অমন, দুকোটি টাকার চেক তোকে আমি লিখে দিতে পারি! বুবু বলে—কেবল বাবার চেক বইটা যদি একবার হাতে পাই। ড্রয়ারের ভেতর চাবি বন্ধ থাকে কিনা।

—আমার দাদার কিন্তু টেবিলের ওপর পড়ে থাকে। দু একটা পাতা সই করাই। যদি দাদা বাড়ি না থাকে আর আমার হঠাৎ টাকার দরকার হয়। মানে খুব বেশি টাকার—আমাকে বলাই আছে, আমার নামে পে টু আর টাকার কথা লিখে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিতে। যত টাকা আমার খুশি। আমার যখন যা দরকার আমি তুলে নিই দাদা দেখতেও যায় না, জানতেও চায় না।

—কত টাকা তুলেছিস তুই?

—তা অনেক। তার কি আর হিসাব আছে। তবে একবারই খুব বেশি তুলেছিলাম। প্রায় পনেরো টাকা। সেই ক্রিকেট ব্যাটটা কিনলুম যেদিন।

—আমাদের চেক যে বাইরে রাখবার যো নেই। দুঃখের সঙ্গেই বুবু বিস্তারিত করে। দিদির ভয়েই তো। কবিতা লেখার খেয়ালে তো হুঁস থাকে না। হয়তো চেক বইয়েই লিখে বসেছে! আপনা হতেই ওর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। —দিদির জন্যে কি মুসকিলই যে হয়েছে আমাদের। ফাঁকতালে যে একখানা চেক ডাঙ্গাব তারও উপায় নেই।

অমল সান্ত্বনা দেয়। —তোর যখন টাকার দরকার হবে আমাকে বলিস। দাদার চেক ভাঙ্গিয়েই তোকে আমি দিয়ে দেব! তাতে আর কি। দাদার টাকা সে আমারই টাকা। আর আমার টাকাও যা তোর টাকাও তাই। তুই তো বন্ধুই আমার।

ওরা চলে যেতে উদ্যত হয়েছে এমন সময়ে ব্যাঙ্কের লোকটি বলে, ওহে দাঁড়িয়ে যাও। এইমাত্র কৃতান্তচাঁদের অনেক চেক জমা পড়েছে। ক্লিয়ারিং থেকে এলেই তোমাদের টাকাটা পেয়ে যাবে। কত আর দেরি? এই ঘণ্টাখানেক।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে একশখানা হাজার টাকার জলছবি পাকেটে করে বেরোয় ওরা।

—দেখলি তো, গরুর কথা কেমন সত্যি হোলো?

বুবু সায় দেয়। হ্যাঁ, ভারি ফলে যায় ওদের কথা। মিথ্যে কথা কাকে বলে, জানেই না গরু বা বলতেই পারে না। সেই জন্যেই মা বলেন যে, গরু হাঁচলে মানুষ মারা পড়ে। গরুর হাঁচির কাছাকাছি যাওয়া আমার বারণ। কখন হেঁচে ফেলবে ঠিক নেই তো। এইজন্যে গরুর কাছেই আমি যাই নে।

—ভালোই করিস। গরু হেঁচে ফেললেই তুই আর বেঁচে থাকবিনে। তাহলে—তাহলে আমিও বেঁচে যাব।

ডালহাউসি স্কোয়ারে এক বড় গাছের ছায়ায় গিয়ে দুজনে বসে।

—বড়লোক তো হলাম। অমল বলে। —গবর্ষির একটা কথা তো থাকলো। তাহলে—তাহলে কি তার আরেকটা কথাও—এঁ্যা? —দাদা কি—দাদা-কি। কথাটা শেষ করতে পারে না অমল। সহসাগত সমস্যার ভারে ভারি ভাবিত হয়ে পড়ে!

—এই কদিনের মধ্যে? বুবু মাথা নাড়ে। —পাগল! তা কি হয় কখনো? বিয়ে! সে যে এক হুলুস্থুল ব্যাপার। কত কাণ্ড হয়

তাতে—কত বাজনা বাজে, লোকজন খায়—মার বিয়েতে হয়েছিল, আমি কিন্তু দেখতে পায়নি। মার মুখে শুনেছি কেবল কিন্তু, দিদির। দিদির বেলায় দেখব।

অমল উৎসাহ পায় না, ম্লান মুখে চুপ করে থাকে।

বুবু ওকে ভরসা দিতে চায়। —দূর। এই কদিনে বিয়ে হয় কখনো? বিয়ের কথা কইতেই এক বছব লাগে, বাবা বলেন। দিদির ক'বছর লাগবে কে জানে! কবিতাব কথা শুনে পিছিয়ে যাব সবাই। কবিতায় ভারি ভয় খায় ববরা; দিদি বলে বর্বরা।

তবু চুপ করে থাকে অমল। কী যে ভাবে!

—অমল, কেন ভাবছিস তুই? আমি বলচি হয়নি—

—না, হয়ে গেছে। হয়েছে নিশ্চয়ই। গরুর কথা কখনো মিথ্যে হয় না। আমি জানি দাদাকে—বেশ ভালো রকম চিনি—আমাব উপর চটে গিয়ে—অমল প্রকাশ কবে—রাগের মাথায় ঠিক বিয়ে করে বসেছে। দাদারা সব পারে।

—তাহলে আর কি হবে! এখন বুবুরও বিশ্বাস জন্মায়—সেই বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধমূল হতে থাকে। কে জানে অমলের দাদাব বিয়েটা ইতিমধ্যে বেধে যাওয়া হয়তো তেমন খুব অসম্ভব নয়। কেননা দিদিদের বিয়ে হওয়া যতই সুকঠিন হোক, দাদাদের বেলায় হয়তো তা তো দুঃসাধ্য নয় ব্যাপারটা।

—কেন যে পালালাম। অমলেব চোখ ছলছল করে। —আমাব যে ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াও ভালো ছিল রে! এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল। অমলের কণ্ঠ শোকাকুল হয়ে ওঠে। বাড়ি গিয়ে কী দেখব কে জানে।—

—কেন, বউদি তো ভালোই রে! খুব আদর করে বউদিরা। বুবু প্রেরণা দিতে চায়। —মন্দ কি এমন?

—ভালো না ছাই! কোনো কথাই তার প্রাণে লাগে না। —যদি

বাড়ি গিয়ে দেখি যে দাদা ছাড়া আরো একজন রয়েছে তাহলে এমন মন খারাপ করে আমার। —অমলের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। টপাটপ পড়তে থাকে।

—কাঁদছিস তুই! বুবু আশ্চর্য হয়। —কাঁদছিস কেন?

—নাঃ টাকায় আমার কাজ নেই। আমি দাদাকে চাই, বড়লোক হতে চাইনে। এসব আমি বিলিয়ে দেব সবাইকে, এক্ষুণি বিলিয়ে দেব। আবার আমি গরীব হয়ে যাব। খুব গরীব হব। তাহলে—তাহলে তো বিয়ে আটকাবে, তুই কি বলিস?

—যদি হয়ে গিয়েই থাকে তাহলে আর কি করে আটকাবে? বলতে গিয়েও এই কথা আটকে যায় বুবুর মুখে। সে চুপ করে থাকে।

—এই নে তোর পঞ্চাশ হাজার। পঞ্চাশখানা নোট ওর হাতে গুনে দেয় অমল। তুই যখন আমার বন্ধু; আমার যা টাকা তার অর্ধেক তোর! চল একটা ট্যাক্সি ভাড়া করি, ক্লাসফ্রেণ্ডদের বাড়ি বাড়ি যাই। প্রত্যেককে দেব একহাজার। এর কিছু আমি রাখব না।

ট্যাক্সিতে বসে বুবু বলে, ক্লাসফ্রেণ্ড আর কজনাই বা আছে। সবাই তো ক্লাস-ফো। তাদের দিবি?

—নিশ্চয়। যদি দয়া করে টাকা নিয়ে আমায় ব'লে দিয়—তারাই আমার বন্ধু আজ।

ফ্রেণ্ড আর ফো মিলিয়ে উনপঞ্চাশ জনকে বাড়িতে পাওয়া গেল। —তারপর তারা ফেরে অমলের বাড়ি। —এ নোটখানা ট্যাক্সি-ওয়ালাকেই দিয়ে দেব। এর শেষ রাখব না। অমল বলে, আবার আমি ফতুর হয়েই বাড়ি ঢুকব। দাদার টাকাই আমার টাকা, আর আমি টাকা চাই না।

অমল পা টিপে টিপে ভেতরে যায়। একটু পরেই আবার তেমনি করেই বেরিয়ে আসে। বলে, এই! তোর দিদিকে দেখলাম দাদার কাছে! গড়গড় করে গল্প আওড়াচ্ছে আর দাদা শুনছে হাঁ করে।

—তাহলে কি দিদির সঙ্গেই—? বুবু দুর্ঘটনাটা ইঙ্গিতেই জানতে চায়।

—কে জানে! দাঁড়া জেনে আসি ব্যাপারটা। এখনো দেখা দিই নি তো! কিন্তু—কিন্তু—বলব কি, বড় ভালো বোধ হচ্ছে না আমার।

বুবু বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। এবার বেরুতে দেরী হয় অমলের। বুবু দাঁড়িয়েই থাকে।

বেশ খানিক পরে অমল গুরু গম্ভীর মুখ নিয়েই বার হয়।

—কি—কি? উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে বুবু।

—এখনো হয়নি বটে ভুরু কপাল কুঁচকে অমল বলে, তবে না হয়ে আর যায় না—একে গরুর বাক্য তারপর তোর দিদির কাণ্ড। একেবারে এ পিঠ ও পিঠ। এতে এ্যাকসিডেণ্ট না হয় কখনো? ভাবি খারাপ তোর দিদির পদ্য। মানুষকে কাবু করে ফেলে একেবারে।

—হোলো কি করে? আমার দিদি তোর দাদাকে জানতও নাবে। বড় বড় চোখকে বুবু আরো বিস্তারিত করে!

—পালিয়েই যে মাটি করেছি আমরা। তোকে খুঁজতে এল তোর দিদি, আমাদের বাড়ি পালিয়ে রয়েছিস ভেবে। তারপর এল তোর দিদির খাতা। ভয়ানক ভয়ানক বিচ্ছিরি যত পদ্য। তারপর যা হবার তাই হয়েছে—আর কি হবে?

—থাক যা হবার হয়ে গেছে। বুবু অমলকে সান্ত্বনা দেয়।

—যেতে দে। কি আর করবি? ভগবান যা করে ভালোর জন্যই।

—ভালোর জন্যে না ছাই! অমল তবু গুমরাতে থাকে।

—কতো ভালো হোলো ভেবে ছাখ। এবার থেকে ক্যাষ্টর অয়েল তোকে আর খেতে হবে না। হাতের কাছে দিদিকে পাবে তাকেই ধরে খাইয়ে দেবে। তুই কেমন বেঁচে গেলি···

নিশকালো মেয়ের রূপালী রেখার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অমলের। ক্ষীণ হাসির আলো ওর মুখে খেলা করে।

—তারপর ছাখ, আমিও বেঁচে গেলাম। মন দিয়ে পড়তে পাব আমি। এখন থেকে যত রাজ্যের পদ্য তোর দাদাকেই পোড়াবে দিদি। না-শুনিয়ে ছাড়বে না তো।

—আমার দাদার মাথা খারাপ হয়ে না যায়, আমি ভাবছি! মর্মান্তিক আশঙ্কা মনের মধ্যে মুষড়ে রাখা অমলের পক্ষে কঠিন হয়। যত সব পাগল করা কাক-ডাকানো কবিতা।

—এই তোরা কি করছিস রে বাইরে! বুবুর দিদি বেরিয়ে আসেন। —আবার পালানোর পরামর্শ হচ্ছে বুঝি? আয় খাবি আয়; অমলেট করেছি—যা তোরা খেতে খুব ভালবাসিস। দু'জনকেই তিনি ভেতরে টেনে নিয়ে যান। —বুবু, ছোটো বেলায় কি বলতিস বলে দেবো অমলকে? কি থেকে অমলেট হয়—সেই কথাটা বলে দেবো?

না, না দিদি! কক্ষনো না। শশব্যস্ত হয়ে ওঠে বুবু। তোমার দু'পায়ে পড়ি দিদি।

—আচ্ছা আচ্ছা! হাসতে হাসতে ওদের নিয়ে গিয়ে লাঞ্চের টেবিলে বসিয়ে দেন।

অমলেট পেটে পড়তেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে অমল। —ভালোই হলো। এবার থেকে ক্যারম খেলা যাবে খুব, সে বলে, চারজনই তো হয়েছি।

মিশকালো মেঘের রূপালী পাড় ক্রমশই আরো জ্বলজ্বল হতে থাকে অন্ধকার ঝলমলানো হয়ে ওঠে।

অমলের দাদা আপত্তির সুর তোলেন, না, না, আমি কেন? তোমরা পিছনে খ্যালো। আমি দেখব এখন! কথাশিল্পের সঙ্গে ক্যারম, তা কি চলে? আমি আর কেন?

—বাঃ, তাও কি হয়! বলেন বুবুর দিদি। যদি কবিতার সঙ্গে ক্যারম চলতে পারে; তবে···

—আচ্ছা, আচ্ছা। সে হবে এখন,—পরে একদিন হবে এক

সময়ে। ভারি হেরে যাবো কিন্তু। শুনেছি খুব ভয়ঙ্কর খ্যালে এরা।

—খেলুক না। ভয় কিসের! আমরা দুজন বসব না হয়। অভয় দ্যান বুবুর দিদি।

তুমি আর আমি এক সাইডে বসব।

—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে এখন, হবে একদিন বরং, মাস দুয়েক বাদে···কিম্বা—কিম্বা, সন্ধ্যের পরই বসবো না-হয়। অমলের দাদার ক্রমেই সাহস বাড়ে। —না-হয় হেরেই যাব। নীল গেমই খাবো হয়ত। পরপরই খাবো না-হয়! ভয় কিসের?

ক্যারম খেলা ঘণ্টাখানেকের জন্যই উহ্য রেখে বুবু অমলের পকেটে পঁচিশখানা নোট গুঁজে দেয়। —আমার যা টাকা তার অর্ধেক তো—তুই যখন আমার বন্ধু! পরীক্ষা পাশ করে টাকার পৃথিবী ভ্রমণে বেরুব দুজনে। কেমন?

—আচ্ছা, সে হবে'খন। পরে হবে। কথাশিল্পীর কায়দায় বলে অমল। —এখন বল দেখি, ছোটবেলায় কি বলতিস তুই অমলেটের কথায়?

—সে বলা যায় না···

—না বলতেই হবে তোকে। অমল চেপে ধরে।

—তখন সবে ভরতি হয়েছি তোদের ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে। তোর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। আমাদের বাড়িতে তুই আসতে শুরু করেছিস, সেই সময়ের কথা··

—তা বল না··

--সেই সময়ে দিদিকে জিগ্যেস করতুম।··আর বলতে চায় না বুবু। তারপর অনেক পীড়াপীড়িতে লজ্জায় লাল হয়ে বলে, বলতুম অমল থেকে অমলেট, না দিদি?

॥ দায়ভাগ ॥

অদূরদর্শী আমাকে বলা যায় না আদপেই। বরং বলতে গেলে আমার দূরদৃষ্টি দস্তুরমতই।

কেননা আমি দেখেছি রমণীয় অনির্বচনীয় যা কিছু সবই সুদূর-পরাহত। সমস্তই দূরদৃষ্টির সীমান্তে। বিধাতার সৃষ্টি তাবৎ চারুকলা চাঁদের ন্যায় চিরকালই দূর থেকে কলা দেখিয়েছে আমায়।

রম্যানিবা, জানি, নিত্যকালই বীক্ষণীয়। এবং দূরবীক্ষণের। কাছাকাছি নিরীক্ষণের বস্তু নয় কখনই।

আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে কত না মোহিনী মায়া ছড়ানো : কিন্তু মরীচিকার ন্যায় অপস্রিয়মান না হলেও কোনটাই তার নাগালের মধ্যে নয়, গালের কাছাকাছি এনে অদূরদর্শনে পরীক্ষা নিরীক্ষার কোনো উপায় নেই। কাজেই আমার চোখ দূরদর্শী অলির মতেই অলিন্দে অলিন্দে পায়চারি করে বেড়ায় বাধ্য হয়ে।

সেদিনও তাই করছিল।

যদিও আমার জানা যে, আমের খোসারা অপরের পদক্ষেপের অপেক্ষা রাখলেও অযথা কারো পদদলিত হওয়া বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়, আর, আমের আছাড় ঠিক আমের আচারের মতন উপাদেয় হয় না। এবং কলার খোসা ছাড়াও কলকাতার রাজপথ পদস্খলনের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত। তবু সেদিন, তখন কেমন যেন সেটা আমার খেয়াল ছিল না আদৌ। তাছাড়া জনৈক দূরদ্রষ্ট, যার নজর সর্বদাই মৈনাকের চূড়ায় নিবদ্ধ সে কি আর ওই নাকের গোড়ায় দেখতে পায়?

অধঃপতনের পরই সেটা দেখা যায়।

আমিও দেখলাম।

বাড়ি ফেরার তাড়ায় পাড়ায় একটা বেওয়ারিশ গলি দিয়ে শর্টকাট করছিলাম। প্রাইভেট গলি গোয়েনকাদের বিরাট প্রাসাদ বাড়িটা যতদূর বিস্তৃত তারই পাশাপাশি লম্বালম্বি এই গলিটা। বাড়ির পেছনের গারাজ থেকে মোটর বার করে যাতায়াতের সুবিধার জন্যই গোয়েনকারা বোধহয় এই জায়গাটুকুর ছাড় রেখেছেন, বাড়িটা আর বাড়াননি তার ওপর। প্রশস্ত প্রাসাদের পার্শ্বতঃ এই অপ্রশস্ত গলি।

প্রায়ই এই গলিপথে বিগলিত হয়েছি, কখনো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু এদিন যেই না অন্যমনে গলতে গেছি, গলিটার মাঝখানে ম্যানহোলের মাথায় লোহার ঢাকনিটা কে বা কারা সরিয়ে নিয়ে গেছল কে জানে, তার মধ্যে বলা নেই কওয়া নেই একেবারে আমি কুপোকাত।

কিন্তু অন্ধকূপপ্রায় হলেও হত্যার আশঙ্কা নেই দেখলাম। তলায় হয়ত জলা থাকলেও তলিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল না। (তলাতে হলেই হয়েছিল আর কি! জলে পড়লে মার্বেলের মতই টুপ করে ডুবে যেতাম নির্ঘাৎ! সাঁতার জানিনে, আর জানলেই বা কি! ওইটুকুন অবকাশে হাত পা ছোড়ার জো কোথায়?) কিন্তু না, বোতলের মুখে ছিপি যেমন আটকে যায় ম্যানহোলটার মাঝামাঝি গিয়ে তেমনি আমি আটকেছি তাই রক্ষে। আমার হৃষ্টপুষ্টতাই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমায়।

চিরদিন এই পুষ্টতার জন্য দুঃখ পেয়েছি, দুঃখ করেছি। কোনেদিন দৌড়তে পারিনে, কায়ক্লেশে পথ চলতে হয়, চলাফেরার কতই না অসুবিধে! কিন্তু দ্রুতগতির সহায় না হলেও এই পুষ্টতাই আজ আমার অধঃপাতের অন্তরায় হয়েছিল। এতদিন বাদে একটুখানি হৃষ্টবোধ করলাম এর জন্যই।

আমার এই ভুঁড়িকে ভুরি ভুরি ধন্যবাদ!

সত্যি বলতে সব দুর্ভাগ্যেরই একটা ভালো দিক থাকে—সব

অভিশাপেরই বরণীয় ভাগ। এমন কি আমার এই ভুরিস্রবা হবারও। তেমন করে দেখলে খুব শোচনীয় ব্যাপারও বেশ রোচনীয় হয়ে দেখা দেয়। যদি আমার এই ভুঁড়িভার না থাকত, মধ্যপদলোপী সমাসের মতই ক্ষীণকটি হতাম তাহলে আমার এই মধ্যপদের অভাবে বিলীন হয়ে কোথায় এখন তলাতে হত যে! এমন করে গর্তটায় গললগ্ন হয়ে গলায় গলায় ভাব জমাতে পারতাম কি? ম্যানহোলটার মাঝামাঝি আধাআধি সেঁধিয়ে বোতলের মুখে মেয়র অব কর্কের মতই টাইট হয়ে বসে বস্তুত এখন আমি ত্রিশঙ্কুর ন্যায় নিঃশঙ্ক!

এখন কতক্ষণ, কতদিনই হয়ত বা, এভাবে অন্তরীণ হয়ে থাকতে হবে কে জানে! প্রায়ান্ধকার এই গলিতে (রাত্তির বেলায় তো লাটুলুটি!) লোকজনের গলাগলি নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে গোয়েনকাদের গাড়ি অবশ্যি যাতায়াত করে, তবে সে কালভদ্রে, ন মাসে ছ মাসে। এ পাড়ায় তাঁরা কম থাকেন, কদাচই আসেন (এই চোরবাগানের এলাকায় চুরি ছাড়িয়ে পাছে ডাকাতির কারণ হয়ে দাঁড়ান সেই ভয়ই কিনা জানি না) আর, তাঁরা এসেই যান যদি এর মধ্যে কখনো, আমি তো তার আগেই এই বন্দীদশায় বদ্ধ থেকে অনাহারে টায়ারড হয়ে ঘুমিয়ে পড়ব, কখন আসবেন টেরও পাব না, আর তাদের মোটরের চাকার টায়ারের তলায় পড়ে চ্যাপ্টা মেরে ওভারটায়ারড্ হয়ে খতম্ হতে হবে তখন আমায়।

এইসব ভাবছি, এমন সময় অদূরে একটি বালককে আসতে দেখা গেল। দূরদৃষ্টিসহায়ে দেখলাম, আমার চেনা বলে বোধ হল না।

এই পাড়ারই কেউ হবে নিশ্চয়। পাড়ার ক'টা ছেলেমেয়েকেই বা জানি! আর জানলেই বা কি, মনে করে রাখতে পারি ক'জনাকে! ক্ষণেকের চিনবার পরেই কেমন করে যে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়! আমার চোখের স্মৃতিশক্তি নেই আর মনের চোখে ছানি।

সত্যি বলতে, মেয়েদের তো চেনাই যায় না কখনো, আর ছেলেদেরও চেনা দায়। একই ছেলে ভিন্ন ক্লাবের রূপ ধরে কতবার

করে কত পূজোর যে চাঁদা আদায় করে নিয়ে যায়।

ছেলেটা কিন্তু আমায় চিনতে পেরেছে মনে হোলো।

—এই যে! এখেনে লট্‌কে গেছেন দেখছি!

—মোটেই লট্‌কে যাইনি! কথাটায় আমি আপত্তি করি; আটকে গেছি বলতে পারো।

বেশ করেছেন, ভালো করেছেন। উঠতে পারছেন না? উঠে পড়ুন। নাকি ভালো লাগছে ওখানে আটকে থাকতে? আরাম পাচ্ছেন খুব?

উঠব কি করে? আঠার মতন সেঁটে গেছি যে। দেখছ না?

হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠতে কি হয়? দু-হাতে ভর দিয়ে উঠুন।

আমার অত বাহুবল নেই ভাই, উপরন্তু দেখাই: হাতও যে আমার দেহের সঙ্গে আটকানো দেখছ না?

বার করতে পারছেন না হাত?

উঁহু। তার জন্যও তো বাহুবল চাই হে।

ধার দিয়ে যেতে পারেন না?

কাকে ধার দিয়ে যায়? ধার দেবার মতন বরাত করে এসেছি কি! ধার নিয়ে নিয়েই গেলাম। চিরঋণী হয়ে রইলাম প্রায় সবার কাছেই। চিরদিনই।

দূর ছাই! সে কথা বলছি নে! রাস্তার ধার দিয়ে যেতে কী হয়? চোখে দেখতে পান না নাকি? চোখ চেয়ে পথ চলতে শেখেন নি এখনও?

বুঝতে পারলাম, মওকা পেয়ে ছেলেটা খুব জ্ঞান দিয়ে নিচ্ছে আমায় এই সুযোগে। কিন্তু জ্ঞানলাভে আমার নিতান্ত অনীচ্ছা এমনকি মিনি মাগনা থাউকো পেলেও না। এমন সময় এই অবস্থায় কখনই নয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলি—আমার নজর তেমন নীচু নয়। আমার

বেশ উঁচু নজর, তাই এই দশা, বুঝলে? তারই এই নজরানা।

বেশ করেছেন। এই ফাঁকে মনের সুখে আপনার মাথায় বেশ চাঁটিয়ে নেয়া যায় কিন্তু।

অ্যাঁ, কি বললে? চমকে যাই শুনেই না।

হাতের সুখ করে নেওয়া যায় বেশ এখন। সে বলে: আপনি একবার রাস্তায় পেয়ে বেমক্কা চাঁটিয়ে নিয়েছিলেন আমায়, মনে আছে?

কবে গো! শুনে তো আমি হতবাক—সে কি এ জন্মে?···আমার তো মনে পড়ে না।

অনেকদিন আগে অবশ্যি। আমার মনে আছে বেশ।

কারণটা কি? তোমাকে আমি চাঁটাতে গেলাম কেন হঠাৎ?

কি কারণ আপনিই জানেন! বোধহয় আমার মাথাটা ন্যাড়া ছিল বলেই। সে জানায়: ন্যাড়া মাথায় চাঁটাতে আরাম লাগে কিনা! লোভ হয় ভারী।

তোমার ন্যাড়া হবার হেতু? কৌতূহল বাড়ে আমার।

পৈতে হয়েছিল যে! তাই আপনি ন্যাড়া মাথা পেয়ে আমায় চাঁটিয়ে নিলেন এক চোট!

কক্ষনো না। ন্যাড়া হলেও নয়। কোনো ছেলেকে কখনো হয়ত আমি একটু আদর করতে পারি কিন্তু কাউকে চাঁটাতে আমার প্রাণে লাগে। আমার কি প্রাণ নেই তুমি বলতে চাও?

না তা বলতে চাই না—আপনি একটা প্রাণী যখন। আপনি আমায় রাস্তায় পেয়ে বললেন, ভাই, তোমায় চিনি না বটে, তোমার মাথায় একটু হাত বোলাতে দেবে আমায়? ন্যাড়া মাথায় হাত বোলাতে ভাল্লাগে ভারী।

তা হতে পারে—সেটা বলতে পারি। আমি স্বীকার যাই: ছেলে বুড়ো যাকে পাই তার মাথায় হাত বোলানোই আমার কাজ বটে। ছেলেদের মাথায় হাত না বোলালে পরে, মেয়েদের

আমার মাথায় হাত বোলাতে দেব কি করে? কোথ্‌থেকে? বলো?

তারপরে বেশ করে হাত টাত বুলিয়ে কষে এক চাঁটি মেরে ছেড়ে দিলেন আমায়···ওই বুঝি আপনার আদর করা?

হতেই পারে না। আমার সোচ্চার প্রতিবাদ: ঐ চাঁটির মধ্যে আমি নেই। শুনলে অবাক হবে, আমি চা-ও খাইনে, tea-ও খাইনে —এমন কি! একটুখানি কফি খাই কেবল—অবশ্যি, অন্য কেউ খাওয়ায় যদি।

ছেলেটি এবার ভালো করে আমায় লক্ষ্য করে—তা, আপনি না হলেও আপনার মতই একজন কেউ আমায় চাঁটিয়েছিল নিশ্চয়, আমার মনে আছে বেশ। তার শোধ না তুলে আমি ছাড়ব না আজ।

তুমি যে দেখছি ঈশপের গুল মারতে লেগেছ হে! সেই ভ্যাড়া আর নেকড়ের গল্পটা আমদানি করলে। যে নাকি সেই ভ্যাড়াটাকে বলেছিল, তোমাকে আমি খাবই আজ, তুমি না করে থাকো তোমার বাবা আমার খাবার জল ঘোলা করেছে। তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

নেকড়ের মতন আমার অমন ঘোলাটে বুদ্ধি নয় মশাই! ছেলেটি নিজের (সেই সাথে নেকড়েটার) সাফাই গায়—তাছাড়া, নেকড়ের ভুল তো হতেই পারে—সব ভ্যাড়াই দেখতে একরকম যে। একরকমই লাগে।

তুমিও ভুল করছ। আমি প্রাণী হতে পারি কিন্তু অতটা ইতর প্রাণী নই, আমার আলাদা ভ্যারাইটি।

তা আপনি যাই বলুন! হাতে পেয়ে হাতের সুখ ছেড়ে দেয় কেউ কখনো? সে এগিয়ে আসে।

না, ছাড়বে না কিছুতেই। চাঁটাবেই দেখছি।

কি করব? হাত তুলে যে নিজের মাথা বাঁচাব তার জো কই?

দেহের সঙ্গে লটকে থেকে আমার দু-হাত সেই গর্তের গর্তে আটকা পড়ে বিলকুল বেহাত। বাধা দেবার উপায় নেই কোন।

তাছাড়া এই মোগলের হাতে খানা খেতে হবে পথে। খানায় তো পড়েইছি। এখন মোগল পাগল আর বালকের ভেতর ইতর-বিশেষ করতে যাওয়া বৃথা।

ছেলেটা আমার মাথায় হাত বুলোতে কার্পণ্য করে না।

অবশেষে আমি বলি, না, চুলগুলো আমার এলোমেলো করে দিলে —সে কথা তুলি না, যদিও জানি আমার শিল্পকলার সবটাই এই কেশকলাপেই, মাথার মধ্যে কিছু নেই আমার—নিটোল নিরেট। আমি বলি যে, যদি অতঃপর নিতান্তই আমায় চাঁটাতে চাও তো!···

না, ন্যাড়া মাথায় চাঁটাতে আরাম লাগে। চুলের ওপর চাঁটিয়ে মজা নেই- টেরই পাবেন না আপনি। দাঁড়ান, একটা নাপিত ডেকে আনি আগে।

বলে ছেলেটি চলে যায়। নাপিত ডেকে আনতে যায় বোধহয়। আসন্ন সমস্যাটা—চুলচেরা করে খতিয়ে দেখি—চুলচেরা সমস্যাই বটে!

পরের ঘরে ভাত আমার বাঁধা থাকলেও মাথার ওপর চাল আমার কোনদিনই নেই। চাল ত ছিলই না, চুলও গেল এবার।

খানিক বাদে ছেলেটি ওরই বয়সী আরো কয়েকটি ছেলের সঙ্গে ফিরে আসে। সবাই মিলে চাঁদা করে চাঁটাবার জন্যেই বুঝতে পারি।

ছাখো, আমি একটা কথা বলি, আগে ভাগেই বলে রাখতে চাই। নিতান্তই যদি আমার মাথায় চাঁটাতে চাও তোমরা, তাহলে একটু আস্তে আস্তে চাঁটিয়ো। মাথা খাটিয়ে খেতে হয় আমায়, আমার ঘিলু চাঁটির চোটে চলকে গিয়ে এদিক ওদিক হয়ে যাবে সে-ভয় আমার নেই। মাথা আমার বেশ নিরেট। কিন্তু তাহলেও প্রাণে আমার না লাগলেও মাথায় কিন্তু বেশ লাগে, তাই বলি কি, নেহাৎ চাঁটাবেই যদি তো একটুখানি মোলায়েমভাবে···মানে, যতটা নরম করে তোমাদের সাধ্য·····

কিন্তু ছেলেরা কি নরম হবার? আমার কথায় তারা কর্ণপাতই করল না।

কিন্তু চাঁটালোও না তারা। সবাই মিলে হেঁইয়া হো করে ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে উপরে তুলল আমাকে। আবার দু-পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আমি হাঁফ ছাড়লাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

রসাতলের গর্ভ থেকে মর্ত্যলোকে নব জন্মলাভ করলাম যেন। নিশ্বাস ফেলে ধন্যবাদ জানাতে যাব তাদের, দেখি, এর মধ্যেই তারা সটকে পড়েছে কখন।

মেয়েদের পরী বলে মনে করলেও ছেলেদের চিরদিনই আমি হনুমান জ্ঞান করে এসেছি। মহাবীরত্বে তাদের পরাকাষ্ঠা হয় না।

পাক্কা আড়াই মণের ধাক্কা আমার মতন একজনকে অতল গহ্বর থেকে টেনে তোলা কীর্তি হিসাবে প্রায় গন্ধমাদন উপড়ে তুলে আনার মতই অতুলনীয়। নিতান্ত হনুমানের পক্ষেই সম্ভব।

সাধে কি আর কবিগুরু বালক বীর বলে গেছেন? শুধু বীর নয়, মহাবীরই বটে।

এরা না থাকলে কোথায় যেতাম আমি আজ? নিজের বাসামুখো তো কখনোই নয় নিশ্চয়। একটা ডেহ পিঁপড়েকে ক্ষুদে পিঁপড়েরা বাগে পেলে অনেকে মিলে টুকরো টুকরো করে বাগিয়ে নিয়ে যায় যেমন, তেম্‌নি এই বিরাট দেহটিকে পেলে সবাই মিলে সাব্‌ড়ে দিত। এতক্ষণ ধরে অপলক নেত্রে তাদের শোভাযাত্রা দেখছিলাম চার ধারে। তারাও নিশ্চয় দেখেছিল আমায়। কখন আমায় খাবলে খুবলে কুরে কুরে পেটে পুরে পিঠে করে নিয়ে যাবে তারই অপেক্ষা ছিল কেবল।

আমিও সেই খুদিদের খুদকারির প্রতীক্ষায় নিশ্চল হয়েছিলাম।

বালক বীরের বেশে এই ছেলেরা এসে মাঝে পড়ে বাদ সাধলো তাদের পিকনিকে!

পরদিন সকালে আবার সেই গলিপথ ধরে গিয়েছি। আমার

গতকালের সমাধিস্থান দেখতেই। ঋষির মতন উন্নাসিক শিবনেত্র নিয়ে নয়, ব্রীড়াবনত নয়নে অধোবদনে তাকিয়ে।

দেখলাম, রাতারাতি কে বা কাহারা বিরাট এক প্রস্তরখণ্ড এনে ঐ গর্তটায় মুখে চাপা দিয়ে গেছে। অবুঝ গর্তটাকে বুজিয়ে দিয়ে গেছে একেবারে।

রাতারাতি এই কাণ্ড করে গেলো কারা? সেই ছেলেরাই নিঃসন্দেহে। পাড়ার কার দায় পড়েছে এত কাণ্ড করার? এই দায়-দায়িত্ব তারা ছাড়া কে নেবার আছে আর?

আমার সব শক্তি দিয়ে ওটাকে নড়াতে যাই—একটুখানি টস্‌কায়ও না পাথরটা। অনড় পড়ে থাকে। মাঝখান থেকে করতল ছড়ে যায় আমার সেই চেষ্টায়। ক'জনায় মিলে কতদূর থেকে এত বড় পাথরখানা তারা ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে এখানে—তাই ভাবি। পাড়ার পাঁচজনার (নাকি এই হতভাগ্য আমারই আবার?) অধোগতির পথ রোধ করতেই তাদের এই প্রাণান্ত প্রয়াস?

পরীর জন্যে করে সবাই—পরের জন্য কেউ কিছু করতে যায় কি কখনো? পারে কেউ করতে? পারলে পরে এরাই পারে—এই ছেলেরাই। এরা কারো পর নয়, আপনারও নয় কারো—পরাৎপরের ন্যায় এই ছেলেরাই আপনপর নির্বিশেষে সবার জন্যে করে যায় নির্বিচারে। যা করার, যা না করার।

সবার দায় এরা পোহায়। কেবল সার্বজনীনের চাঁদা আদায়ই নয়—পাড়ার সবার দায়িত্বও এরা নেয়—এই চাঁদরাই।

আদায়ভাগ থাকলে দায়ভাগ থাকেই।

॥ শ্রীমতী ভেটো ॥

অনু আজকের কাগজে আমরা স্থানলাভ করেছি। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে মুখ তুলে—প্রাণকেষ্ট ঘোষণা করল।

তাই নাকি ?

এই শোনো না। আনন্দ সাহায্য সমিতিতে এপর্যন্ত প্রাপ্ত চাঁদার মোট পরিমাণ—

ও! একেই তুমি বলছ খবরের কাগজে ওঠা ? অনিমা ধাক্কা দিল মাঝখানে।

অবিশ্যি—নাম ঠিক ছাপায়নি আমাদের—কারো নামই ছাপেনি। কাগজের টানাটানি কিনা আজকাল, কিন্তু তাহলেও ওই মোট পরিমাণের মধ্যে কিছু পরিমাণে আমরাও রয়েছি তো।

ওকে খবরের কাগজে ওঠা বলে না। সংবাদপত্রে স্থান পাওয়া কাকে বলে যদি জানতে চাও, তাহলে আমাদের প্রতিবেশী মাননীয় ভট্টশালী মশাইকে ছাখো। প্রায় প্রত্যেকদিনের কাগজেই কেমন বড় বড় হরফে ওঁর নাম বেরুচ্ছে। কোথায় গেলেন, কি করলেন, কিসের সভাপতি হলেন, কী বক্তৃতা দিলেন, কবে কোন অসুখে পড়লেন—সমস্তই বার হচ্ছে কাগজে। সংবাদপত্র জগতের হীরো যদি কাউকে বলতে হয়তো ওঁকেই।

তা—তা—বটে। প্রাণকেষ্টকে কথাটা মানতে হয়। ও রকম নামজাদা দৃষ্টান্তের সামনে এসে নিজেকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করে সে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।

আজ এক মিনিস্ট্রি ভাঙছেন, কাল এক মিনিষ্ট্র গড়ছেন—কিং-মেকার একজন। মানুষের মত মানুষ ওকেই বলে। তোমার মত

মুখচোরা ভীতু অপদার্থের নাম আবার কাগজে ছাপবে? তাহলেই হয়েছে! —ওই রকম হতে পারো?

ঐখান থেকে কয়েক পা বাড়িয়ে খানকতক বাড়ী পেরুলেই বারো নম্বরে অনারেবল ভট্টশালীকে আমরা পেতে পারি। তাঁর তর্জ্জন গর্জ্জনে কেবল অত বড় বাড়ীখানাই নয়, সমস্ত পাড়া সারাক্ষণ সরগরম। বাড়ীর সম্পর্কে বারো নম্বর হলেও বীরপুরুষ হিসেবে তাঁকে এক নম্বর বললে কিছু অত্যুক্তি হয় না।

এই মুহূর্তে তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে দাবড়াচ্ছিলেন।

—তোমাকে আমি কি বল্লুম কালকে? আমার দ্বারা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটনের খবরটা কাগজে ছাপাতে বলেছি কি বলিনি?

-আজ্ঞে হ্যাঁ!

—বলেছি কি বলিনি—কি হ্যাঁ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—আমার ছড়ি নিয়ে এসো। ছড়িটা গেল কোথায়?

—আজ্ঞে আপনার হাতে।

—হাতেই তো! হাতে না তো কোথায় থাকবে আবার? কানের পাশে থাকবে নাকি? কোথাকার উজবুক একটা। যাও আমার বড় গাড়ীটা বার করতে বলো গে।

সেক্রেটারী হাঁফ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ছড়ি হাতে ভট্টশালী মশাই ঘরময় দাপাদাপি করতে লাগলেন। অন্যদিক থেকে মুচ্‌কি হাসি মুখে নিয়ে শ্রীমতী ভট্টশালী যে আবির্ভূত হয়েছেন, সেদিকে পর্যন্ত তিনি দৃকপাত করলেন না। পত্নীর উপস্থিতিও তাঁকে ওর বেশী বিচলিত করতে পারল না।

বলি হয়েছে কি? এ রকম কেন গা?

ধ্যেৎ! বল্লেন মাননীয় ভট্টশালী। তার বেশী আর কিছু বল্লেন না।

—রাগ কোরোনা, লক্ষ্মীটি! সত্যি আমি আমার কথা রেখেছিলাম। গিয়ে দেখলাম তুমি চলে গেছ।

কথা রেখেছিলে? কটার সময় ফার্পোয় মিট্ করবার কথা ছিল শুনি? ভট্টশালীর কথাগুলো টগ্-বগ্ করতে থাকে।

একটু দেরী হয়েছিল বটে—

একটু দেরী! কেন যে আসতে পারোনি তাও জানি, কোথায় গেছলে তাও আমি জানি। শ্যামবাজারের সেই রণেন ছোড়াটার ওখানে কালকে গিয়েছিলে, তা কি আমি জানিনে?

শ্রীমতী ভট্টশালী একখানা ঘৃণা ব্যঞ্জক কটাক্ষে এই কথার সদুত্তর দিলেন—কটাক্ষটা উল্লাসিক পথ বেয়ে উপলক্ষ্যের উপরে নেমে এল। লক্ষ্যভেদও করল বোধহয়। ডলির এই নাক বাঁকানো চাহনি কোনোদিনই ভট্টশালী মশাই সইতে পারেন না—এতে যেন কেবল তাঁর প্রতিই নয়, তাঁর বংশমর্য্যাদার প্রতিও কটাক্ষপাত করা হয়। পত্নীর বনেদী মহিমার কাছে তাঁর বানানো মহিমা যেন খাটো হয়ে তুচ্ছ হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টি আজকে তাঁর আরো অসহ্য বোধ হোলো।

ডলু, তুমি কি জানো না কি ভালো তোমায় আমি বাসি? তবু তুমি কেন যে এরকম—কেন যে আমায় কষ্ট দাও—আচ্ছা, তুমি কি দিব্যি গেলে বলতে পারো যে, কাল তুমি ওই-লোকটার ওখানে একেবারে যাওনি?

ওর ত্রিসীমানায় ছিলাম না। কালকে আমি বালীগঞ্জে গেছলাম। হঠাৎ বোনের অসুখের খবর পেয়ে যেতে হোলো—সেখানেই ছিলাম সারারাত। ফার্পোয় তোমাকে দেখতে না পেয়ে খবরটা জানিয়ে যেতে পারিনি। যা তোমার ইচ্ছে ভাবতে পারো!

তুমি সত্যি কথা বলছ না। বল্লেন ভট্টশালী।

আমার বোনকে ফোন করো না কেন? করে জানো না এক্ষুনি? ডলির চোখ ঝকমক করে উঠলো।

তোমার বোনকে আমার জানা আছে। তোমার যে কোনো সাপ ব্যাং গল্পে সে সায় দেবে। তোমারই বোন তো!

বেশ, যা তোমার খুশী।

ডলু—বলে তিনি শুরু করলেন—কিছুটা নরম সুরেই এবারে—কিন্তু ডলু তার আগেই কক্ষ্যচ্যুত হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে মাননীয় ভট্টশালীর মনে হোলো পিছু পিছু যান—কিন্তু তক্ষুনি তিনি পিছিয়ে এলেন। নাঃ, তাহলে ডলু ভাববে তিনি নিতান্তই স্ত্রৈণ – স্ত্রীর কৃপাভিক্ষু; আর সেটা তাঁর দুর্বলতার পরিচয় হবে। বৌ-এর কাছে তিনি যে কাবু হয়ে আছেন, এ কথা নিজের মনের কাছে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে সেই কাবুগিরি আরো বেশী জাহির করে সর্ব্বসমক্ষে ফলাতে তাঁর লজ্জা হয়।

রাইট অনারেবল মিস্টার সরকার এসেছেন। আপনাদের দুজনের গুরুত্বপূর্ণ যে আসন্ন মিলনের কথা কাগজে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই সম্পর্কেই বোধ হয়—ওঁর সেক্রেটারী এসে জানাল।

বলতে না বলতে মিস্টার সরকার দরজা ভেদ করে এসে হাজির।

কিরে চেংটা, আছিস কেমন বল।

কালু যে, কি মনে করে হঠাৎ?

মিনিস্ট্রি তো যায়। গভর্ণর ফের আবার বিগড়েছেন। পেছন থেকে যেরকম প্যাঁচ কষে মন্ত্রীসভায় ভাঙন ধরিয়েছিস্, তাতে মাইরি ভট্টশালী, তোকে দুশো বাহাদুরি দিতে হয়।

সে কথা আমি ভাবছি নে। বৌকে নিয়ে ভারী বিপদে পড়া গেছে!

কেন, কি হোলো তার আবার? ভট্টশালিনীও কি বিগড়েছেন নাকি? কালু জিজ্ঞেস করলেন।

আর বোলোনা ভাই। একটা ছোঁড়া জুটেছে। ছোঁড়াটা নাকি আবার খুব ভালো খেলোয়াড়—কি করি বলো তো?

কি আর করবে? রেজিস্ট্রি করা বিয়ে যখন, অসুবিধেটা কি? তালা দিয়ে যদি না রাখতে পারো, তালাক্ দিয়ে দাও।

তাই বোধ হয় ও চায়—তাহলে তো ওর ভালোই হয়। কিন্তু আমি—বলতে কি—ডলুকে একটু—এখনো একটু—

তাহলে আর কি করবে, ল্যাজ গুটিয়ে পায়ের তলায় পড়ে থাকো চুপ্‌টি করে। তোমার নাকি পাড়ায় বীরত্বের খ্যাতি আছে, তাই বীরোচিত পরামর্শই দিয়েছিলাম।

বৌ-এর কাছে ভাই কেউই বীর নয়। ভট্টশালী দীর্ঘনিবাস ছাড়লেন।

এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল, মাঈজী এলাহাবাদের গাড়ীতে বাপের বাড়ী চলে গেলেন।

শুনলে? শুনলে তো? বাপের বাড়ী না ছাই! এলাহাবাদের নাম করে সেই গুণ্ডাটার ওখানে গিয়ে পড়ে থাকবে। শ্যামবাজারেই ওর এলাহাবাদ। ওর বৃন্দাবন। এরকম বৌকে নিয়ে কি করা যায়? কুচি কুচি করে কাটলেও তো রাগ যায় না।

বল্লুম তো। কাটাকুটির ফ্যাসাদে না গিয়ে—

সেই ভালো কথা। আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠলেন ভট্টশালী—এক্ষুনি আমি বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করছি। ডাকাচ্ছি আমার এ্যাটর্নীকে। কিন্তু—কিন্তু—একেবারে চরম পন্থা নেওয়ার আগে আর কিছু কি করা যায় না? খবরের কাগজে নোটিশ দিয়ে বৌ-এর সঙ্গে আমার সম্পর্কশূন্যতার বিবরণ দিলে কেমন হয়?

প্রত্যুত্তরে মাননীয় সরকারের শ্রীমুখ থেকে কিছু খসবার আগেই সেক্রেটারীর কাছ থেকে জবাব এল: খুব ভালো হয় স্যার। তাতে করে প্রদর্শনীর খবরের চাইতেও আরো বেশী আপনার নাম ছড়িয়ে পড়বে। গতকল্যকার ক্ষতিপূরণ করতে সে উদগ্রীব।

ঠিক বলেছ। বল্লেন ভট্টশালী: কিন্তু এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার তোমার উপরে দিয়ে ভরসা করা যায় না। তুমি যা কাজের

লোক। হয়ত এমন যায়গায় ছেপে বেরুবে, চোখেই পড়বে না কারো। ডলুর চোখই ফস্‌কে যাবে। তার তো আর তোমার মতন আগাপাশতলা খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস নেই। অ্যামিউজ-মেণ্টের কলমে ছাপতে হবে এটা। যেখানে সব সিনেমার বিজ্ঞাপন বেরয়। আমি নিজেই যাবো খবরের কাগজের অপিসে।

এই বলে হাতের ছড়ির এক আঘাতে টেবিলের উপরস্থ আঠারো ক্যারেট সোনাব ফ্রেমে বাঁধানো ডলুর ছবিটিকে তিনি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন।

কি লাভ রেখে? বল্লেন তিনি!

কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন আপনার? এই কাগজটায় বেশ স্পষ্ট করে কপিটা লিখে দিন। এক ইঞ্চির জন্যে পাঁচ টাকা পড়বে। চার লাইনে এক ইঞ্চি। গড়ে পাঁচটা শব্দে এক লাইন ধরা হয়।

এই কাগজটায় লিখব?

হ্যাঁ—দেখি হয়েছে। এই নিন টাকার রসিদ। আপনার কিসের? সিচুয়েশান্ ওয়াণ্টেড?—আমাদের বক্স নম্বরে দিতে চান? বেশ, লিখুন এইখানে, এই কপিটায়।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে বসে প্রাণকেষ্ট বিজ্ঞাপন-দাতাদের বার্তা নিচ্ছিল, এমন সময় ঝড়ের বেগে অনারেবল মিস্টার ভট্টশালীর প্রাদুর্ভাব ঘটলো সেখানে।

কে? কে এখানে বিজ্ঞাপন নিচ্ছে? তুমি? তুমিই নাকি? প্রাণকেষ্টর প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বর্ষিত হোলো।

হ্যাঁ মশাই।

যে কয়জন বিজ্ঞাপনদাতা সেখানে জড়ো হয়েছিল, ভট্টশালীকে দেখে তাদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গেল।

আমার এই বিজ্ঞাপনটা আমি দিতে চাই। —বল্লেন ভট্টশালী।

সবুর করুন একটু। এঁরা আপনার আগে এসেছেন, এঁদের

কাজটা আগে নিই, তারপর শুনছি আপনার। —প্রাণকেষ্ট ভট্টশালীকে জানালেন।

এ্যাঁ, কি বল্লে? আমি সবুর করব? আমি? তুমি জানো আমি কে? গর্জন করে উঠলেন ভট্টশালী।

এখুনি জানতে পারবো, তাড়া কি তার? আপনার বিজ্ঞাপনের দ্বারাই তো জানা যাবে। দয়া করে একটু বসুন—আপনার আগে এই তিনজন মোটে রয়েছেন—আপনার আগে এসেছেন এঁরা, এঁদের হয়ে যাক্।

পাগলামী রাখো তোমার। আমি অনারেবল মিস্টার ভট্টশালী। আগে আমার বিজ্ঞাপন নাও।

ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিক পরের পর নেব। প্রাণকেষ্ট অচঞ্চল।

কি! কি বল্লে? এখনো তোমায় ভালো কথায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি—গর্দভ কোথাকার! অপেক্ষা করতে আমি অভ্যস্ত নই, জানিয়ে দিচ্ছি তোমায়।

দয়া করে ঐ চেয়ারটায় বসুন—

কি! আমি বসবো—আমি বসবো চেয়ারে? বটে! জানো—তোমার এই কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে বলে এক্ষুনি তোমার এই লাট-সাহেবের চাকরী আমি ঘুচিয়ে দিতে পারি, তা জানো?—

না যদি বসতে চান আপনার খুসী। হ্যাঁ কি বল্লেন আপনি? সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশীয়া সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা পাত্রীর জন্য—? ভট্টশালীর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে প্রাণকেষ্ট অন্যত্র কর্ণপাত করলো।

অনারেবল ভট্টশালী টেবিলটার ওপর এক ঘা বসিয়ে দিলেন—তাঁর ছড়ি দিয়ে—তাকাও এদিকে। এখনো বলছি—নইলে ভাল হবে না কিন্তু—রাগে তিনি গরগর করতে থাকেন।

প্রাণকেষ্ট অদ্ভুতভাবে তাঁকে উপেক্ষা করল। আপনার বিজ্ঞাপনটা কি? একটি মোটরগাড়ী, সিডন বডি, সম্পূর্ণ নূতন

অবস্থায়, সুলভ মূল্যে বিক্রী করতে চান? এই তো? বেশ লিখুন এই কাগজটায়।

ছাখো, এই ছড়ির এক বাড়িতে তোমার মাথা উড়িয়ে দিতে পারি তা জানো?

আপনার পড়বে সাত টাকা বারো আনা। এই রবিবারের কাগজেই বেরুবে—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

বাখো তোমার আদিখ্যেতা। ভালো চাও তো—

আপনার পালা আসুক। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

কানে শুনলেও একথা প্রত্যয় হয় না। এ লোকটা কাকে একথা বলছে? জানো আমি অনারেবল মিস্টার ভট্টশালী? প্রভু! এরা জানে না এরা কি করছে? অনেকটা এই জাতীয় যীশুখ্রীষ্ট সুলভ বিস্ময় মিস্টার ভট্টশালীর।

আমার কাছে আপনি একজন বিজ্ঞাপনদাতা মাত্র। অন্যান্যদের মতই একজন। পাঁচশো টাকার বিজ্ঞাপন নিয়ে এলেও তাই। খোদ লাটসাহেব হলেও তাই। আপনি এসেছেন তিন জনের পর! আপনার আগের সবার হয়ে গেলেই আপনার দিকে আমি নজর দেব, আমায় বলতে হবে না। —বলুন আপনার কি?

আমি কোন বিজ্ঞাপন দেব না, বিজ্ঞাপন নেব।

—বিজ্ঞাপন নেব! তার মানে? বিজ্ঞাপনদাতার কথায় প্রাণকেষ্ট অবাক হয়।

মানে আমি বিজ্ঞাপন নিতে এসেছি। আমার বিজ্ঞাপনটা ফেরৎ নিতে এসেছি আমি।

কিছু বুঝতে পারছি না, পরিস্কার করে বলুন।

আজ সকালে আপনাদের অফিসে—এই কাউণ্টারেই আমি একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছলাম না? আমার কুকুর হারানোর বিজ্ঞাপন···সেই যে আমার কুকুর···দামী বিলিতি কুকুর, মাথার কাছটা সাদা, আর সারা গায় হলুদের ছোপ ছোপ···সেই কুকুরটা—চিনতে পেরেছেন?

আজ্ঞে না, আপনার কুকুরের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।.....তারপর ?

মনে পড়ছে না আপনার ? এই কাউন্টারে তখন আরো পাঁচ-ছজন কাজ করছিলেন যে ! তাঁরা সব গেলেন কোথায় ?

বলতে পারি না। কে কি কাজে বেরিয়ে গেছেন কে জানে ! সব কাজ দয়া করে চাপিয়ে গেছেন এই অভাগার ঘাড়ে। বলুন তারপর ?

আহা, তাঁরা থাকলে তো মনে করিয়ে দিতে পারতেন আপনাকে। তাঁরা সকলেই এই বিজ্ঞাপনটায় খুব আগ্রহ দেখালেন দেখলাম। তাতে আমার পাঁচশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা ছিল। যে কেহ আমার কুকুরকে যার মাথাটা সাদা আর সারা গায় জায়গায় জায়গায় হলদের ছাপ—জীবিত ধরে এনে দিতে পারবে তাকে আমি নগদ পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেব ·· ··

হ্যাঁ, মনে পড়েছে এইবার। সারাদিনে সাতশো বিজ্ঞাপন নিতে হয়। কত আর খেয়াল থাকে মশাই ! তা, সেই বিজ্ঞাপনটা ত আপনার কালকের কাগজে বেরুবে, কাল সকালের কাগজেই দেখতে পাবেন। প্রাণকেষ্ট বলে : বিজ্ঞাপনটার প্রুফ চান নাকি ?

না, প্রুফ আমি পেয়ে গেছি। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে যে হাতে হাতে ফল হয় বলে থাকে লোকে, তার প্রমাণ আমি পেয়ে গেছি। আপনাদের কাগজের বিজ্ঞাপন যে সত্যই অব্যর্থ তাতে আর কোন ভুল নেই।

যথার্থই ! কতো হাজার সার্কুলেশন জানেন আমাদের কাগজের ? দেখবেন আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার ফলে নিশ্চয় আপনার কুকুরকে ফিরে পাবেন·····

পেয়ে গেছি। বিজ্ঞাপনটা দিয়ে বাড়ী ফিরে দেখি আমার হারানো কুকুর ফিরে এসেছে।

দেখলেন তো। আসতেই হবে। তবু তো এখনো বিজ্ঞাপনটা তার নজরে পড়েনি। বেরোয়নি এখনো ·····

আর সেটা বার করার দরকার নেই। বিজ্ঞাপনটা আমি নিতে এসেছি……

তা কি করে হয়? সে ত ছাপতে চলে গেছে প্রেসে…

আটকান ছাপানো। বিজ্ঞাপনের জন্য যে টাকাটা আমি দিয়েছি সেটাও ফেরৎ পেতে চাই।

কোন বিফাণ্ড তো দেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের টাকা ফেরৎ দিতে আমরা সম্পূর্ণ অপারগ। তাছাড়া ছাপাখানাকে আটকানোর এক্তিয়ার আমার নেই…তাছাড়া আরো ঝামেলা আছে…

আরো ঝামেলা? আরো আবার কিসের ঝামেলা? ভদ্রলোক উদগ্রীব হন জানতে, উদ্বিগ্নও হন একটু।

সে ঝামেলা আমার নয়, আপনার। মনে পড়ছে আমার এখন। আমার সঙ্গে যাঁরা তখন কাজ করেছিলেন তাঁরা সবাই আপনার পুরস্কারের লোভে আপিস ছেড়ে তক্ষুণি আপনার সেই কুকুরের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। বলেছেন যে কুকুর না বের করে তাঁরা ফিরবেন না।

বলেন কি মশাই? ভদ্রলোক তো হতবাক।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে তারা ছ'জনায় ঐ রকম ছটা হলদে সাদা কুকুর জোগাড় করে পুরস্কারের জন্য আপনার বাড়ীতে গিয়ে বসে আছেন এখন আপনার অপেক্ষায় দেখুন গিয়ে, আপনি চটপট বাড়ী চলে যান। বলে প্রাণকেষ্ট এবার তাঁর পাশের ব্যক্তিকে সম্বোধন করেন: বলুন এবার আপনার—কিসের বিজ্ঞাপন বলুন।

আমি একটা মূল্যবান জিনিষ কুড়িয়ে পেয়েছি। একটা মেয়েলী রিস্টওয়াচ। বালিগঞ্জের ট্রামে পেয়েছি কাল রাত্রে—

ছাখো, আমি আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করব না এক্ষুনি আমার কথা তোমায় শুনতে হবে। ভট্টশালী চেঁচিয়ে ওঠেন।

ঠাণ্ডা হোন। এই তো হয়ে গেল! আর তো মোটে একজন রয়েছেন, একটা হয়ে গেলেই আপনার কাজে হাত দেব। হাঁ বলুন কি

বলছিলেন ? বালিগঞ্জের ট্রামের—

অসহ্য অসহনীয়—অপরিসীম বেয়াদবি ! ফেটে পড়লেন ভট্টশালী। তারপর সহসা নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। না, সামান্য এক কেরাণীর কাছে তিনি সম্পূর্ণ পরাভূত হয়েছেন। এর পর থেকে তিনি রাগের চোটে আপন মনে স্বগতোক্তি করে চল্লেন —কিন্তু কেউ তাতে আর কান দিচ্ছিল না।

আপনি বলছেন যে, একটা মূল্যবান জিনিষ কাল রাত্রে বালিগঞ্জের ট্রামে আপনি কুড়িয়ে পেয়েছেন ? আপনার বিজ্ঞাপনটা হারানো ও প্রাপ্তি বিভাগে স্থান পাবে। একটা লেডিজ্ রিস্টওয়াচ —তাই বল্লেন না ?

হ্যাঁ মশাই।

(উঃ, কী বদমাইসি ! —দেখে নেব্ আমি। তুমিও দেখে নিও—দেখো তোমার আমি কি করি—কি দুর্দশাই না করি ? জেনে রেখো এটা তখন টের পাবে যে আমি কে ?)

ট্রামের কোথায় পড়েছিল ? কি ভাবে কুড়িয়ে পেলেন বলুন তো ? প্রাণকেষ্ট শুধায়।

লেডীজ সিটের ঠিক তলাতেই। বসতে গিয়ে চোখ পড়ল আমার।

কোন সময়ে ?

রাত্তির ন'টা হবে তখন। ট্রামে তখন লোক ছিল না বিশেষ। শীতকালের রাত্তির তো।

—(আমার জন্মেও এরকম দেখিনি। দেখবো এমন আশাও করিনি কখনো। হতভাগাটার আস্পর্দা দেখেছ !)

রিস্টওয়াচে কোন বিশেষ চিহ্ন কিছু ছিল কি ?

হ্যাঁ, ডালার দিকটায় ডি-ভি খোদাই করা। এই দেখুন না আমি নিয়েই এসেছি সঙ্গে করে।

ভট্টশালী গোঁ গোঁ করে উঠলেন। হঠাৎ বাজখাঁই বদলে অন্য আওয়াজ বেরোলো তাঁর।

আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন? জয়গৌরবে পরিতৃপ্ত প্রাণকেষ্টর এতক্ষণ পরে বিজিতের ওপরে যেন একটু মায়া হয়।

দেখি রিষ্টওয়াচ্‌টা। বলে ভট্টশালী হাত বাড়ালেন, প্রাণকেষ্টর ঘোরতর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করেই গায়ের জোরে ঘড়িটি তিনি হস্তগত করলেন।

ডি-ভি এতো ডলির রিষ্টওয়াচ; কি সর্বনাশ!

এই রিষ্টওয়াচের মালিককে কি আপনি চেনেন নাকি? জিজ্ঞেস করল প্রাণকেষ্ট।

চিনি বলে চিনি। হাড়ে হাড়ে চিনি। আমার স্ত্রীর রিষ্টওয়াচ্‌ তো! ডলু ভট্টশালী—ওরই নামের আদ্যক্ষর ঐ ডি-ভি। আপনি বলছেন, কাল রাত নটার সময়ে বালিগঞ্জের ট্রামে এটা পেয়েছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত প্রায় নটাই হবে তখন।

বলুন, আপনার কি? আপনার পালা এসেছে এইবার। বলল প্রাণকেষ্ট, ভট্টশালীকে সম্বোধন করেই বলল।

য়্যাঁ—? চমকে উঠলেন ভট্টশালী।

আপনার পালা—

ধন্যবাদ! ভট্টশালী বলে উঠলেন হঠাৎ—তোমার—তোমার নাম কি?

প্রাণকেষ্ট। প্রাণকেষ্ট পতিতুণ্ডি।

আমাকে মাপ করো ভাই। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তুমি আমার অসীম উপকার করেছ। তোমার কর্তব্যনিষ্ঠায় আমি বিমুগ্ধ। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনো শোধ করতে পারব কি না জানিনা। তুমি আমাকে বড় বাঁচিয়ে দিয়েছ আজকে।

কিছু না—কিছুমাত্র না। এটা আর উপকার করা কি? সাংবাদিকের কর্ত্তব্য করেছি মাত্র। সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে কাজ করি—সামান্য সাংবাদিক আমি; তার বেশী কিছু নই।

সাংবাদিকের চেয়ে বড় এখন কে—তার চেয়ে বেশী কাজ

আজকের দুনিয়ায় কে করছে শুনি? কিন্তু সে কথা থাক—বলে মাননীয় ভট্টশালী মশাই নিজের মান্যগণ্যতা সমস্ত বিসর্জন দিয়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন: যে কথা আমি জানতে চাই, তা হচ্ছে —হ্যাঁ, এখন আমার পালা এসেছে কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়। এবার আপনারই পালা তো। কি বিজ্ঞাপন দিতে চান বলুন?

আমি আর বিজ্ঞাপন দিতে চাই না। এবং ঐ ভদ্রলোকের আব হারানো-প্রাপ্তির বিজ্ঞাপন দেবার দরকার নেই। এলাহাবাদেব গাড়ী কটার সময়ে কোন্ ষ্টেশন থেকে ছাড়বে, সেইটে আমি কেবল জানতে চাই।

সে তো এখানে না, এনকোয়ারি অফিসে। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন মশাই।

সে অফিসটা আবার কোন ধারে?

আজ্ঞে এখানে নয়। হাওড়া ষ্টেশনে।

বলে সর্ব শাস্ত্রী। ধরলে কুমীব ছাড়ে কিন্তু ধরলে ছাড়ে না স্ত্রী।

কোন শাস্ত্রী একথা বলেছেন জানা নেই, কোন হাকিম কি না তাও জানিনে, তবে, ছড়ার বয়ানে যদ্দুর আমার ধারণা, এটা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রায়।

আর, কুমারীজনকে স্ত্রীজনেব মধ্যেই ধরতে হয়। কেননা, কুমারী হলেও লিঙ্গমহিমায় সে-ও স্ত্রী। আজ যে কুমারী কাল সে বিয়ের পিঁড়িতে সিঁথিব সিঁদুরে লাল নিশান উড়িয়ে এয়োস্ত্রী।

এবং কুলীন আর কুমারীর মধ্যে কেবল শুধু আ-কারের তফাত বই তো নয়। নইলে ঈ-কাব, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হলেও, উভয়ের মধ্যে ঠিকই আছে।

আব দুজনের কামড় প্রায় একরকম।

দাঁত একবার বসলে হয়। তারপর নাছোড়বান্দা। নিজের বান্দাকে ছাড়বার পাত্র নয়। আব, বহুৎ গুম্ফবানের কান কেটে দেয় তেমন মেয়েকে ওই গুম্ফবতী ছাড়া কী বলা যায়?

খুন কবে না, ফাঁসি মকুব হয়ে না, অগ্নিযুগের দাদাগিরির দৌলতেও নয়—দ্বীপান্তর ছিল আমার অদৃষ্টে। কোন ফেবেববাজি না করেও··· কপালেব ফেরে আন্দামানে যেতে হল আমায়···

এই তো সেদিন—দেশ স্বাধীন হবাব অ্যাদ্দিন পরে·· রবীন সেন বাত্যাতাড়িত হয়ে এল ঢাকার থেকে। এসে, না থেমেই, সেই তাড়নার মুখে কুটোর মতন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমায়—ধারণাতীত তাড়ায়—আমার আন্দাজের বাইরে—একেবারে আ··মানে।

সে বললে, ভাই, আর না। সভ্যতার এই পাপ-সংস্পর্শে আর নয়। কলিযুগের এই কলুষতা—বিংশ শতাব্দীর এই বিষ—এই রিরংসা,

এই সংঘাত, এই সংকটের থেকে এস আমরা সুদূরপরাহত হয়ে যাই। রাজধানীর এত হানাহানির মধ্যে কেন আর? নাগরিক জীবনের ছোঁয়াচ থেকে এস আমরা পালিয়ে যাই—চলে যাই—দূরে—অতি দূরে অন্য কোথাও। আর কোথাও।

আর কোথায়? আমি জানতে চাই।

এমন কি, বন্য কোথাও হলেই বা মন্দ কি? বনেবাদাড়ে, অরণ্যে কি পাহাড়ে, প্রকৃতি মায়ের লীলা-নিকেতনে গিয়ে খেলা করিগে চল।

লীলাখেলার কথা বলছ? কিন্তু নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধার দিকটা ভুলে যাচ্ছ তুমি। এখানকার জীবনের এই মান—

জীবনের মান? মান আছে, কিন্তু মর্যাদা কই? হাই স্ট্যাণ্ডার্ড অফ লিভিং-এর কথা তুলছ তুমি? কিন্তু এই মানদণ্ডেই তো এর প্রাণদণ্ড হয়েছে ভাই, টের পেয়েছ সেটা? জীবনের মান নয়, জীবনের মানে। তাই খুঁজতেই বেরুনো যাক্ এবার।

রবীন সেন যেভাবে, আমার ভাষায় আমাকে পরাস্ত করল তারপর আস্ত থাকা গেল না আর। কালাপানি পার হতে হল তার সঙ্গে।

জীবনের মানে টের পেতে আন্দামানে পৌঁছলাম···

পোর্টব্লেয়ারে পা দিয়েই থামল না রবীন। বললে—আরে রাম! এ যে দেখছি আরেক শহর। যুদ্ধের মরশুমে সরকারী মদতে ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে। না ভাই সভ্য ভব্য হয়ে এখানে থাকা পোষাবে না আমাদের। নির্জন জায়গা দেখতে হবে একটা। কোন জনহীন বিজন দ্বীপ।

ছাখো, কবিগুরু বলেছেন বটে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে। কিন্তু তার মধ্যে কি বন্য কোনখানের ইঙ্গিত ছিল কিছু? তাছাড়া তুমি ভুল করছ—বলে আমি ওর আত্মাকে বিদ্ধ করি—তুমি তো রবিনসন নও, রবীন সেন। এক কথায়, আত্মবিদ্ধির সাহায্য করি ওর।

রবিনসন ছিল না কোনদিন, ওটা গল্পকথা। তবে এইবার থাকবে। এই রবীন সেনই ক্রুশো হবে, তুমি দেখে নিয়ো।

আমার কথায় ক্রুষ্ট হয়ে সে বললে।

আন্দামানের গা-লাগাও বিস্তর ছোটখাট দ্বীপ। ইতস্ততঃ ছড়ানো সেই দ্বীপপুঞ্জের পরিধি কোনটার বিশ মাইল, কোনটার বা বিয়াল্লিশ। কিন্তু ওসার কম বলে কি অসার বলে, কে জানে, এখনো সব এলাকায় জনপ্রাণীর আমদানি হয়নি।

সেই অচলিত সংগ্রহের একটাকে বেছে নিয়ে খুঁটি গাড়লাম আমরা। গলা বাড়ালাম ক্রুশকাঠে—রবিনসনের ক্রুশোত্বের যূপকাষ্ঠের পরাকাষ্ঠায়।

শুরু হল আমাদের নির্বাণদশা। সভ্যতার শূন্যলোকে অক্ষুণ্ণ শান্তির জীবন। জীবদ্দশায় মোক্ষলাভ। জীবনের মোক্ষম চোট।

রোজ সকালে উপলাহত ঢেউয়ের কলস্বরে ঘুম ভাঙে আমাদের। সূর্যের মুখ দেখে বউনি হয়, তাই রোজকার রোজগার। শুষ্ক ঘাসের শয্যা ছেড়ে তুড়ি লাফ মেরে উঠি। খড় বাঁশ দিয়ে যে-ঘর আমরা বেঁধেছিলাম—তার মধ্যে খড় ছিল, খড়খড়ি ছিল না। কিন্তু না থাকগে, বিছানায় বসে সমুদ্র দেখার বাধা ছিল না একটুও। কেন ?, ঘরের মাথায় ছাউনি উঠলেও, কোন দেওয়াল খাড়া হয়নি তখনো।

দিনভর দেয়ালা।

বিছানা ছেড়ে সটান সমুদ্রে গিয়ে পড়তাম। সেই ছোট্ট দ্বীপের মুঠোয় সমুদ্র তার গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল। নিজেকে গলিয়ে অতি ছোট্ট এক উপসাগর গড়েছিল। তার সেই গলাবন্ধ ছিল আমাদের হাতের মুঠোয়।

বৃহদাকার না হলেও, হ্রদাকার সেই সামুদ্রিক অলি-গলিতে সমুদ্রের সুবিধা ছিল সব কিন্তু দাপট ছিল না। বঙ্গোপসাগরের বড় রাস্তায় পা বাড়াতে যারা নারাজ (যেমন আমি), মনে হয়, সেই সব

ভয়ে-পেছপাদের জন্যেই বিধাতা বিরলে বসে জলপথেও যেসব গলি-ঘুঁজি বানিয়েছেন এটি তার একটি।

সমুদ্রস্নান সেরে আমরা কোদাল নিয়ে পড়ি তারপর। সেইটাই আমাদের সকালবেলার পড়া। নিজের ফসল নিজেই ফলাও—তার প্রথম পাঠ। একটুখানি জমি কুপিয়ে সুসার করে শাক-সবজির আসর বসানোর চেষ্টা আমাদের। ক্রমে ক্রমে আরো জমিয়ে, গাজর-ভুট্টা ফলনের ব্যবস্থা করা যাবে। জমিদের আরো কোপান্বিত করে তরকারির উচ্চস্তরে—কলামূলোর সমারোহে—আরো বেশি ফলাকাঙ্ক্ষায় এগুবার কল্পনা যে একেবারে ছিল না তা নয়।

ভুট্টার চাষে দুজন খোট্টা আমাদের সাহায্য করত। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আসার সময় রবীন তাদের নিয়ে এসেছিল।

কালাপানির পুরনো আসামী—বকেয়া কয়েদী দুজন। জেলের খাটনি খতম হবার পরেও থেকে গেছল আন্দামানে, মুলুককে ফেরেনি। হয়তো একেবারে ফেরার, ফেরা-র পথ রাখেই নি আর। কিংবা নাগরিক জীবনের আওতায়, সভ্যতার ছোঁয়াচে ফেরত যেতে রাজী হয় নি মনে হয়। আদর্শ সাকরেদ্ জ্ঞান করে বেছে তাদের সঙ্গে করে এনেছে রবীন। অনেক বাছবিছাব করে এক দ্বীপান্তর থেকে আরেক দ্বীপান্তর টেনে নিয়ে আসা ওদের।

এবারের দ্বীপান্তরটাই জবর, বলেছিল রবীন—পালাবার আর কোন পথ নেইকো ওদের।

কেন?

কি করে পালাবে? যে নৌকো ভাড়া করে আমরা পোর্ট ব্লেয়ার থেকে এসে পৌঁছেছি সে কি আর ভুলেও কোনদিন এপথে ভিড়বে আর? আমাদের মত আর কোন ভবঘুরের যদি এধারে ঘুরবার দুর্মতি হয় তবেই আমরা কোন নৌকোর মুখ দেখতে পাব আবার. নয়তো এ-জন্মে নয় আর।

সে তো ভয়ের কথাই ভাই। বলতে গিয়ে আমার বুক

কেঁপে ওঠে, ওরাই নয় কেবল, আমরাও তো ফিরতে পারব না তাহলে।

ফিরছি নাকি আর? পাগল! রবীন বলল—এ দুটোর কি নাম রাখা যায় ভাবছি তাই। রবিনসনের লোকটার নাম ছিল ফ্রাইডে—এদের কি নাম রাখা যায় বল তো?

বুধ আর বেস্পতি রাখো। আমি বললাম—দুজনাই তো বুদ্ধু। শুদ্ধ ভাষায় বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।

তাই রাখা হল ওদের নাম। বুধ আউর বেহপ্‌পৎ।

আনকোরা নাম পেয়ে খুশী খুব। নাম-ডাকের লালসা নেই কার বলুন?

বুদ্ধি না থাক, লোক দুটো আমাদের কাজে লেগেছিল খুব। বাঁশ-খড় দিয়ে বসবাসের আস্তানা খাড়া করেছিল ওরাই।

জমি কোপানোর ভার আজকাল ওরাই সামলায়, আমরা তাল গাছের তলায় বসে আরাম করি। মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ি, হুকুম ছাড়ি জোর গলায়—ওতেই হয়। এ রকমের জীবন-যাপন মন্দ নয়। শহরের অ-বিশ্রাম অশান্তির থেকে এখানকার অবিশ্রাম শান্তি, একেক সময় দুর্বিষহ ঠেকলেও ক্রমেই বেশ ভাল লাগে। নব দাম্পত্যের মতই, সব কিছুই গা-সওয়া হয়ে যায়—অশান্তির মতন শান্তিও সহনীয় হয় এক সময়।

তবে অসুবিধা আছেই। মাঝে মাঝেই দেখা দেয় নানারূপে—প্রায় অভাবিত ভাবেই। প্রকৃতিমাতার স্তন্যদানে কি লালন পালনে কার্পণ্য না থাকলেও প্রকৃত মতি বুঝে ওঠা দায়। এক একসময় মনে হয়, মাতৃস্নেহ তো নয়, জামাতৃস্নেহ তো নয়ই, মাতা প্রকৃতির যেন বিমাতার প্রকৃতি। সেই সময়ে সভ্যতার পুনর্মূষিক হয়ে শহুরে-শাশুড়ির জামাই-আদরে ফিরে যাবার সাধে মনটা ছটফট করে।

করে বেশির ভাগ আমার।...একদিন আর আমি থাকতে পারি না। সকালের জলকেলির ফাঁকে বলে ফেলি ওকে—দ্যাখো রবীন,

আমাদের যেন একটু আদিখ্যেতো হচ্ছে। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি? এতটা না করলেও চলে। শহরে নাই বা গেলাম, নাই বা বনলাম শহুরে, কিন্তু সেখান থেকে একালের জিনিসের এক-আধটা এখানে আনলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না, তাতে সভ্যতার সম্পর্কেও যেতে হয় না, নাগরিকতার লেশমাত্রও লাগে না গায়ে, সরল জীবন আর সমুচ্চ চিন্তার হানিও হয় না একটুখানি—অথচ বেঁচে থাকার আরাম বাড়ে।

যথা? রবীন আমাদের সর্বদাই যথাযথ। সব সময়েই যেন সে উদাহরণের মুখাপেক্ষী।

অযথা বলছিনে। বলে আমার যথোচিত নিবেদন: মনে কর গোটা কতক মুর্গি নিয়ে এলে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে—যেখান থেকে ঐ বুদ্ধুদের এনেছ—সেই সময়েই আনতে পারতে তো। মুর্গিরা কিছু সভ্য-ভব্য না। কিন্তু ডিম পাড়ে। ডিম কিছু সভ্যতার ডিণ্ডিম নয়। গভীর জঙ্গলেও পাড়া যায়—বন্যকুক্কুটরা পাড়েন নিশ্চয়। তাহলে···। আমি খানিক থামি, দম নেবার জন্যে নয়, অমলেটের সম্ভাবনা আমার মনকে কেমন উতলা করে তোলে।

তাহলে? যথারীতি তার দৃষ্টান্ত লাভের অপেক্ষা।

তাহলে, যে জীবন এখানে এমন ঝিমিয়ে পড়েছে, ঢিমিয়ে যাচ্ছে বলতে গেলে, সেটা ডিমিয়ে উঠতে পারত। খুব খারাপ হত না। আর ঐ মুর্গির সঙ্গে একটা প্রাইমাস স্টোভও আনলে না হয়। শহরে কি সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পাওয়া যায় না? আর আনুষঙ্গিক কিছু মাখন টাখন···

আর গরু টোরু? আমার প্রস্তাবকে গোরুত্ব দেবার জন্যেই সে যেন বলে কথাটা। কিন্তু আমি গায়ে মাখি না।

কেন, রোজ সকালে নেয়ে উঠে অমলেট খাওয়াটা—কিংবা নাইবার আগেই না হয়—খেয়ে নাই আবার নেয়ে খাই—করাও যায় নাকি? সেটা কি খুব খারাপ? খালি খালি গাজর চিবিয়ে কী হয়?

গায়ের জোর বাড়ে।

নেহাত বাজে ওজর। গাজর দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে। গাজর টম্যাটো ঐসব ভিটামিনদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আমার কথা হচ্ছে, দরকারী দু-একটা টুকিটাকি জিনিস এখানে নিয়ে এলেও এ জায়গা রাতারাতি কিছু শহর হয়ে উঠবে না।

সামান্য সুতানুটির থেকে কি করে কলকাতার সূত্রপাত হয়েছিল জান তুমি?

জানিনে ইতিহাসের নটিনেসের কতটুকুই বা জানি। তবে একথা আমি বলতে পারি যে আমরা দুজনে মিলে যত চেষ্টাই করি নে কেন, এই ক্ষুদ্র দ্বীপকে কিছুতেই কলকাতা বানিয়ে তুলতে পারব না। আমাদের এ-জীবনে নয়, এক পুরুষে তো নয়ই। আমাদের দু-পুরুষেরো কম্মো না। হলফ করেই তা বলা যায়।

তা ঠিক। কিন্তু ক্রমেই তুমি তা চাইবে সেইদিকেই ঠেলছ মনে হচ্ছে—আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ছেদ আনবে শেষটায়। বলে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফ্যালে।

তার মানে?

তার মানে—দুপুরুষের কম্মো নয় বলছ তুমি—তুমি আর জান না! তারপরেই তুমি আনতে চাইবে কোন এক নারীকে।

আনাড়ির মতন বোকো না।

আর নারী মানেই নতুন পরিচ্ছেদ। পরির মতন দেখতে নাও হয় যদি—ছেদ সে ঘটাবেই।

যা বলেছ। নারীঘটিত এর কল্পনাশক্তির আমি তারিফ করি। আমার ভাষায় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার তার প্রয়োগ-নৈপুণ্যেরও।

আর, একটা নারী হলেই সব হয়। পাল কলা পূর্ণ হয়—সবসাশের কিছু আর বাকি থাকে না। সভ্যতা সমাজ সব তখন এসে যায়। নিজের থেকে শহর গড়ে ওঠে, সংঘাত জাগে। দুই পুরুষের মাঝখানে

এক নারী—বা তার চেয়ে সংঘাতিক আর কিছুই হতে পারে না। সুন্দ-উপসুন্দর উপাখ্যান তোমার জানা আছে নিশ্চয় ?

বিদ্যাসুন্দরের কথা বলছ ? আমার জিজ্ঞাসা, কিন্তু তার মধ্যে কোন পুরুষ ছিল না ভাই ! একটা সুড়ঙ্গ ছিল কেবল। অবশ্যি শেষ পর্যন্ত একজন পুরুষ এসেছিলেন বটে—পুরুষ নয়, রাজপুরুষ—একজন কে দুজন। প্রথম সুরঙ্গ পথে সেই নগরকোটাল, তারপরে রাজা স্বয়ং।

তোমার বিদ্যের দৌড় যে ঐ অব্দি—তা আমার বেশ জানা আছে। সে ভারতচন্দ্রের স্থলে মহাভারত এনে ফ্যালে।

আমি ভারতের দিকে ফিরি। —তেমন দুর্ঘটনা যদি বাধে, বেশ. আমি দেশেই ফিরে যাব। একা নারী আর এক আনাড়ি—একমাত্র পুরুষই না হল—সেই রমণীরত্নকে নিয়ে তুমিই থাকবে এইখানে।

তাতেই কি বাঁচোয়া ? তাই তো ছিল হে সবার গোড়ায় - ইডেন উদ্যানে ? আদিম আর হবা। তাই থেকেই—তার থেকেই—তারপর যা হবার সব হল, সবাই এলাম। হল সব কিছু। আজকের এই কোটি কোটি মানুষ এল কোথ্‌থেকে শুনি ? সেই কটিতট থেকেই না ? মহাভারতেরও আগেকার আদিমপর্ব টেনে আনে রবীন—সেই প্রথম আদমসুমারির থেকেই তো আজ এই মহামারি। এত মারামারি। ভারতের ত্রিশ কোটি, চীনের ষাট—আর, তারপরে অধুনা ওই কোরিয়ার লড়াই। কি করিয়া শুরু হল বারেক ভাবিয়া দ্যাখো ভাই।

আমি আর ভাবতে পারি না। পাগল হয়ে যাই।

দেখতে দেখতে নারীও দেখা দিল একদিন অচিরে। ও-ই দেখল।

নারী না এসে যায় না। অনিবার্য রূপেই তারা এই নশ্বর জীবনে এসে পড়ে। নিজগুণে দেখা দেয়, নিজরূপে প্রকট হয়।

আর, নারীদের যা দস্তুর, স্বভাবতই একটা ব্যবধান রাখে।

অখানেও ছিল—তবে এমন কিছু দুস্তর নয় বোধহয়।

আমাদের দ্বীপটার গা-লাগা ফুটকির মতন আরেকটা দ্বীপ ছিল শ'খানেক ফার্লং দূরে। এতদিন সেটাকে আমরা নজর দিইনি। এখন সেখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হতেই লক্ষ্যভূত হল।

ছাখো, ছাখো! একটা মেয়ে দেখা যাচ্ছে না—ঐ দ্বীপটায়?

তুমিই ছাখো। আমি উৎসাহ দেখাই না।

দাঁড়াও, বাইনাকুলারটা বার করি—নেকনজর দেবার পর সে নজরানা দিতে লাগে—আহা! মরি মরি! কি অপরূপ সুঠাম চেহারা কি ফিগার! কটিমাত্র আচ্ছাদন—একেবারে আদুড় গা।

হাওয়াই দ্বীপের মতই নাকি হে? বিলকুল টপলেস? বল কি? কোন আদিবাসী মেয়ে হবে তাহলে।

তাকিয়ে ছাখো না! কি সুন্দর! সে বাইনাকুলারটা আগিয়ে দেয়।

চর্মচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি বেশ। নড়ছে, চড়ছে—ওই ঢের। ওর বেশি দেখার দরকার নেই আমার। বলে, অদূরবর্তিনীদেরই আমি নাগাল পাইনি কোনদিন আর এ তো একশো ফালং দূরে—লং লং ওয়ে ট টিপারারি। লং ওয়ে টু গো!

নারীরা আনাড়িদেরই বেশি নাড়া দেয়। সে সারাদিনই উপকূলে বাইনাকুলার নিয়ে বসে থাকে - একদৃষ্টে তাকিয়ে।

মেয়েটাও আমায় লক্ষ্য করেছে। বলল একদিন। —লক্ষ্য করেছে, বুঝেছ?

করবেই তো। না করে পারে? কবিগুরু প্রেমের ফাঁদ পাতার কথা বলে গেছেন না? ভুবনময় সেই মায়াজাল ছড়ানো।

ও আমাকে চাইছে মনে হয়। আমি যাব ওর কাছে। দূরত্বটা বেশি নয়, একশো ফার্লং নয়, পঞ্চাশ ফার্লংয়ের বেশি হবে না কিছুতেই! যাব?

যেন আমার অনুমতির অপেক্ষা।

যাও। বলে দিলাম সাফ।

লাফ দিয়ে সে জলে পড়ল। খানিকটা সাঁতরে গিয়েই না বাপ ঝপ করে ফিরে এল আবার।

বাবা! কি কুমীর ভাই সমুদ্রেব এই খালটায়। আরেকটু হলেই ঠ্যাং পাকড়াত আমার। পালিয়ে এসেছি খুব।

খাল কেটে, খালে সাঁতাব কেটে, কুমীর আমদানি করলে তো? এখন এই কিনারায় নাওয়া টাওয়াও দায় হবে আমাদের।

দিনেব পর দিন যায়।

দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী—এট্‌সেট্‌রা, এট্‌সেট্‌রা।...

আবে ছাখো, মেযেটা তীব-ধনুক নিয়ে কি কবছে ছাখো।

আমি দেখি। সাদা চোখেই দেখতে পাই। —তীব দিয়ে মাছ-টাছ শিকার করছে বোধহয়। মাছই তো খাদ্য ওদের। ঐ আদিবাসীদের। ফলমূলও খায় বোধ হয়।

চেয়ে থাকাই সাব হবে আমাদের। কোনদিন তো সমুদ্রে পা নামানো যাবে না। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে। —জীবনটা চেয়ে চেয়েই কেটে যাবে দেখছি।

একদিন ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, আমাদেব কিনারায়, চড়ার ওপরে লম্বা-চওড়া একটা কুমীর শুয়ে রয়েছে।

দেখবে এস। ডাক দিলাম ববীনকে—খাল কেটে কি চীজ নিয়ে এসেছ ছাখো তুমি।

বুধ বেহপ্পৎ আগেই দেখেছিল, কুড়োল নিয়ে এসে তারা কোপাতে লেগেছে ততক্ষণে— আজ বহুৎ উমদা খানা হোবে বাবু। কুম্‌ভীরকা মাস বহুৎ বড়িয়া হ্যায়।

রবীন তাদের চামড়া বাঁচিয়ে কাটতে বলল।

কি হবে কুমীরের চামড়ায়? আমি জানতে চাই—জুতো বানাবে? তাহলে তো সেই শহরেই যেতে হয়। এখানে মুচি কোথায়?

দেখতে পাবে। শুকোক আগে চামড়াটা।

চামড়াটা শুকোলে পর সেটাকে সেলাই করে সে একটা নেকার-বুকারের মত একাধারে কোটপ্যাণ্ট মতন বানাল। তারপর তার হাত-পা-র মধ্যে নিজের হাত-পা গলিয়ে সামনের বোতামগুলো এঁটে দিয়ে বলল—এইবার আমি সাঁতরে যাব ওই দ্বীপটায়। আমার মানসীর কাছে।

আর কুমীর? খালের যত কুমীর? তারা কি তোমায় ছেড়ে কথা কইবে নাকি?

কিচ্ছু বলবে না। টেরই পাবে না আমাকে। কাকের মতন কুমীরও নিশ্চয় স্বজাতীয় মাংস খায় না।

তারপর আর অধিক বলা বাহুল্যমাত্র বিবেচনা করে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

বেশ খানিক বাদে ফিরে এল। না, সে নয়। সেই মেয়েটি।

ঘাসের ঘাগরা পরনে। সূর্যালোক আবরণে।

সেই বাবু কুথাকে গো? শুধালো সেই মেয়েটি।

বাবু তো তুমার খোঁজেই গিয়েছে গো! তারপরই আমার বিস্ময় লাগে, কৌতূহল জাগে—তুমি সাঁতরে এলে কি করে? কুমীররা কিছু বলল না তোমায়?

কুমীর কুথাকে? সে জানায়: আমি তো এই খালের সব কুমীর মেরে মেরে খতম করে দিয়েছি। বিলকুল খতম।

খতম্? কি করে করলে?

তীর-মেরে মেরে। ইখানে বাবুর কাছে আসবার লেগে হামি রোজ কুমীর মারতেছি। রোজ চার পাঁচটা। আজ শেষ কুমীরটাকে খানিক আগে মারলাম। সেথাকার জলটা রক্তে লাল হয়ে আছে এখনও। বাবু কুথায়?

শেষ কুমীরের সাথে সেই বাবুটিও নিরুদ্দেশ। কিন্তু সে-কথা কি তাকে বলা যায়?